
গ্রীস দেশের
রূপকথা
আহসানুল হক
RAFI
ANIK

গ্রীসদেশের রূপকথা





বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯০
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

বা. এ. ১৩৯৬

পাণ্ডুলিপি
ভাষা সাহিত্য উপবিভাগ/১২/৮৩-৮৪

মুদ্রণ সংখ্যা
২২৫০ কপি

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাসাসপ বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা

প্রচ্ছদ
হাশেম খান

অঙ্গসজ্জা
কৌশিক কাদের

মূল্য : পঁচিশ টাকা

GREESCE DESHER RUPKATHA: A selection of Greek Myths, retold in Bengali by Ahsanul Haque, Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh First Edition February, 1984. Price : Tk. 25·00 ; US Dollar 3·00

সূচী

অলিম্পাসের চূড়া

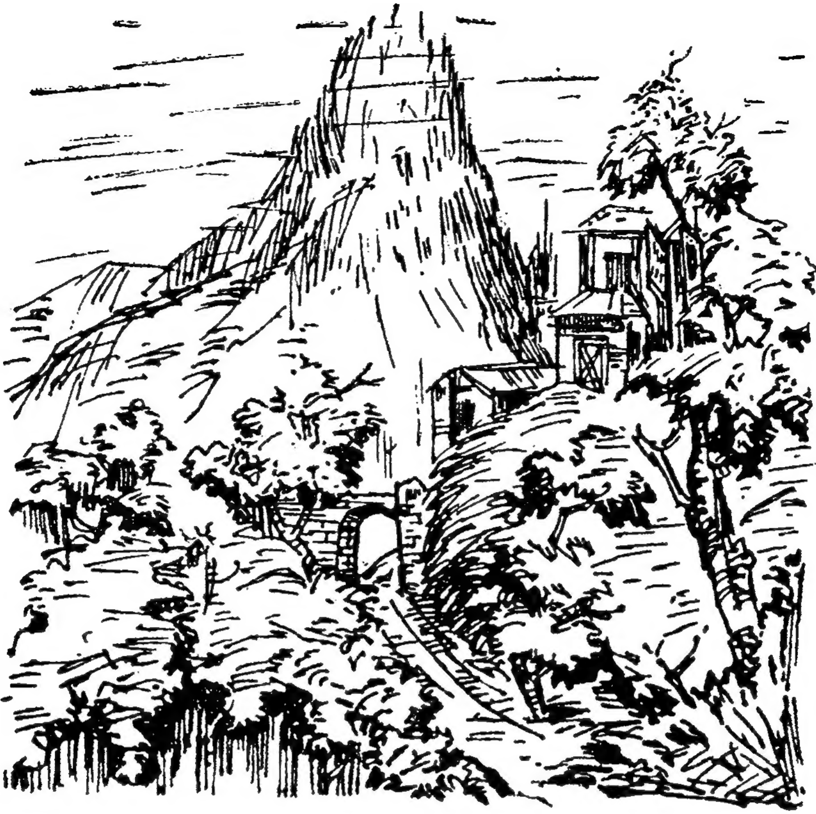
গ্রীসের মেসিডনিয়া আর থেসালি প্রদেশের মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে এক পাহাড়ের সারি। এর উচ্চতা ৯৭০০ ফুট, আর সারা বছর ধরে বরফে ঢাকা থাকে এর প্রধান চূড়াটি। এটি হচ্ছে গ্রীস্‌দেশের বিখ্যাত অলিম্পাস পর্বত।

সেকালের গ্রীকরা মনে করত, এই অলিম্পাসের চূড়ায় বাস করেন তাদের দেবতারা। চূড়ার ঢালুতে ছিল তাঁদের সারি সারি সুরম্য প্রাসাদ। দেবতাদের রাজা ছিলেন জুপিটার। দিনের বেলা সকল দেবতা একত্র হতেন তাঁর প্রাসাদে। দেবরাজকে ঘিরে চক্রাকারে বসতেন সবাই—অল্পবয়স্ক দেবতারা নৃত্য করতেন আর কাব্যের দেবীরা বীণাযন্ত্র সহযোগে শোনাতেন গান। এখানেই বসত তাঁদের প্রতিদিনের ভোজসভা। সম্মুখে উপস্থিত হত স্বর্গের খাবার 'এম্ব্রোসিয়া'; আর সুন্দরী দেবী হিবি নিজহাতে পরিবেশন করতেন 'অমৃত'। অলিম্পাসের চূড়ার এই আনন্দপুরীর একটু নীচ দিয়ে ছিল মেঘের ঘন আবরণ।

দেবতাদের সম্পর্কে সেকালের গ্রীকদের ধারণা ছিল বড় বিচিত্র। তাঁদেরকে তারা কল্পনা করত ঠিক মানুষেরই আদলে। কেবল তাঁরা ছিলেন আরো বড়, অনেক সুন্দর, আর অনেক বেশী শক্তিশালী। মানুষের মতই তাঁদের ছিল পারিবারিক সম্পর্ক, এমন কি বংশধারা। রাগ, ভয়, হিংসা, ছল-চাতুরী—এগুলিতেও তাঁরা কম যেতেন না।

গ্রীক কাহিনীতে দেখা যায়, প্রথমে ছিলেন পৃথিবী-মাতা জীয়া, তারপর এলেন আকাশদেব ইউরেনাস্। এঁদের সন্তানরা 'টাইটান্' অথবা দৈত্য নামে পরিচিত। এই ইউরেনাস নিজের সন্তানদেরকে কিন্তু সন্দেহ করতেন, বড় হয়ে যদি তারা তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নেয়! তাই জন্মের পরই তিনি তাদেরকে আটকে রাখতেন এক গুহায়। এ অবস্থা আর সহ্য করতে না পেরে মা জীয়া তাঁর শেষ সন্তান সময়-দেব ক্রনস্‌কে এক যায়গায় লুকিয়ে রাখলেন, আর সে বড় হলে দুইয়ে মিলে এক কাস্তের আঘাতে ইউরেনাস্‌কে আহত করে টাইটান্‌দের মুক্ত করলেন। এরপর থেকে শুরু হল এই টাইটান্ বা দৈত্যদের রাজত্ব।.

কিন্তু কিছু কাল পরে আবার ঘটল একই রকম ঘটনা। নিজেরই এক ছেলে তাঁকে হটিয়ে দিয়ে তাঁর যায়গা দখল করবে, দৈববাণীতে একথা জানতে পেরে ক্রনস্ জন্মের পরই সন্তান-দের গিলে ফেলতেন। এবারও শেষ সন্তান জুপিটারকে কৌশলে তাঁর হাত থেকে রক্ষা করে লুকিয়ে রাখা হল ক্রীট্ দ্বীপের ঈজিয়াস পাহাড়ের এক গভীর জঙ্গলে। তার বদলে আঁতুর ঘরের কাপড়ে বাঁধা বিরাট এক পাথর ক্রনস্ গিলে ফেললেন সন্তান মনে করে। ক্রীট্ থেকে এসে আইডা পাহাড়ের বনভূমিতে ক্রমে বড় হয়ে উঠলেন জুপিটার। তারপর তিনি প্রস্তুত হলেন পিতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে। সমুদ্রদেব ওশেনাসের কন্যা মেটিসের কাছে থেকে এক পানীয় নিয়ে তিনি খেতে দিলেন ক্রনস্‌কে; আর খাওয়া মাত্রই ক্রনস্ উগরে দিলেন



এক এক করে সবগুলি সন্তান। এরপর ক্রনসকে বন্দী করে রাখা হল এক দুর্গম গুহায়। এখন থেকে শুরু হল দৈত্যদের সন্তানদের রাজত্ব। মনে রাখতে হবে, গ্রীক রূপকথায় এঁরাই হলেন আসল 'দেবতা'।

জুপিটাররা ছিলেন তিন ভাইঃ জুপিটার (এটি আসলে রোমানদের দেওয়া নাম; গ্রীক নাম হল 'জিউস্'), নেপচুন আর প্লুটো। ক্ষমতা লাভ করার পর জুপিটার ভাইদের সঙ্গে এলাকা ভাগ করে নিলেনঃ জুপিটার হলেন দেবরাজ, আকাশের অধীশ্বর; নেপচুন ও প্লুটো যথাক্রমে সমুদ্র ও পাতালের। পৃথিবী ও অলিম্পাস পর্বত রইল সমানভাবে তিন জনের। জুপিটার মেঘচালনাকারী, ঝড়বৃষ্টিবাদল তাঁর হুকুম মেনে চলে। তাঁর প্রধান অস্ত্র বজ্র, তাঁর পোষা পাখী বাজ তা ডানায় বয়ে বেড়ায়। জুপিটারের মহাশক্তিশালী ঢালের নাম 'ঈজিস্'।

জুপিটারের রানীর নাম জুনো (গ্রীক নাম 'হেরা')। ময়ূর তাঁর প্রিয় পাখী। রংধনুদেবী আইরিস্ তাঁর অনুচরী। প্রয়োজনে রংধনুর সেতু বেয়ে আইরিস্ স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসেন তাঁর রঙীন উত্তরীয় পরে।

মার্স্ ছিলেন গ্রীকদের যুদ্ধের দেবতা।

জুপিটারের কন্যা মিনার্ভা ছিলেন জ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার দেবী। তাঁর প্রিয় পাখী পেঁচা, আর প্রিয় গাছ জলপাই।

গ্রীক দেবদেবীদের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত বোধ হয় ভিনাস্, জুপিটারের আর এক মেয়ে। তিনি ছিলেন সৌন্দর্য ও ভালবাসার দেবী। ভুবনমোহিণী রূপ নিয়ে সমুদ্রের ফেনা থেকে তিনি উঠে আসেন পৃথিবীতে। সমীরণ-দেব জেফিরাস্ ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তাঁকে বয়ে নিয়ে এলেন সাইপ্রাস দ্বীপে। সেখানে ঋতুর দেবীরা তাঁকে সাজিয়ে উপস্থিত করলেন দেবতাদের সভায়। ভিনাসের প্রিয় পাখী রাজহাঁস ও কবুতর। গোলাপ ও মেহেদি তাঁর প্রিয় গাছ।

গ্রীকদের সূর্যদেবতা এপোলো, আর চন্দ্রদেবী ডায়ানা। এঁরা ভাইবোন। এপোলো তীর ছোঁড়া, ভবিষ্যৎ-বাণী ও সঙ্গীতের দেবতা। চন্দ্রদেবী ডায়ানা কুমারীদের দেবী।

সমুদ্রদেব নেপচুন। তাঁর মাছ-মারা ত্রিফলা বর্শা হাতে তিনি সমুদ্র হ্রদ নদী—সকল জলরাশির ওপর কর্তৃত্ব করেন।

কৃষিকাজের দেবী সিরিস্। তাঁর আদরের দুলালী সুন্দরী প্রসারপিনাকে চুরি করে পাতালের দেবতা প্লুটো তাঁর রানী করেন।

পান-ভোজন আর আনন্দ-উৎসবের দেবতা ব্যাকাস্।

এ ছাড়া ছিলেন ন' জন 'মিউজ' অথবা শিল্প-সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ভাগ্য দেবীরা ছিলেন সংখ্যায় তিনজন। মানুষের সমস্ত জীবন ছিল তাঁদের হাতেঃ ক্লথো সুতো কাটেন, ল্যাকেসিস্ তা হাতে ধরেন, আর এট্রপস্ তা কাঁচি দিয়ে কেটে দেন—এ তিনটি ঘটনার মধ্যেই নিহিত থাকে মানুষের জন্ম, জীবনকাল ও মৃত্যুর রহস্য।

'ফিউরি' নামে তিন চণ্ডী দেবী—ন্যায় নীতির খেলাফকারীদের শাস্তি দিতে সব সময় প্রস্তুত। ফিউরিদের চুলে সাপ জড়ানো, চেহারা ভয়ঙ্করী!

অহংকারীদের দর্প চূর্ণ করতে সদা জাগ্রত প্রতিশোধের দেবী নেমেসিস্।

প্যান্ ছিলেন চারণভূমির দেবতা। তাঁর প্রিয় আবাসস্থল আর্কেডিয়ার নিভৃত অঞ্চল।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে প্রধান গ্রীক দেবদেবীদের বিবরণ। কিন্তু এঁদের অনেকেই আমাদের কাছে পরিচিত পরবর্তী কালের রোমানদের দেওয়া নামে। যেমন, রোমান জুপিটারের মূল গ্রীক নাম জিউস্, রোমান ভিনাসের গ্রীক নাম এফ্রোডাইটি। নীচে তাই কয়েকজন প্রধান দেবদেবীর গ্রীক ও রোমান নাম পাশাপাশি দেওয়া হলঃ

	গ্রীক	রোমান
দেবরাজ	জিউস্	জুপিটার
দেবতাদের রানী	হেরা	জুনো
জ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার দেবী	প্যালাস এথেনি	মিনার্ভা

	গ্রীক	রোমান
সৌন্দর্য ও ভালোবাসার দেবী	এফ্রোডাইটি	ভিনাস্
সূর্যদেব	ফিবাস্ এপোলো	এপোলো
চন্দ্রদেবী	আর্টেমিস	ডায়ানা
পৃথিবীদেবী	ডিমিটার	সিরিস্
সমুদ্রদেব	পসাইডন্	নেপচুন
পাতালদেব	হেডিজ	প্লুটো
আনন্দ-উৎসবের দেবতা	ডায়োনিসাস্	ব্যাকাস্
যুদ্ধ-দেবতা	এরিজ্	মার্স
দেবদূত	হার্মিজ্	মার্কারি

অগ্নিবাহক প্রমিথিউস্

দেবতাদের সম্পর্কে সেকালের গ্রীকদের ধারণা ছিল বড় বিচিত্র। তারা মনে করত, দেবতারা 'টাইটান' বা দৈত্যদের সন্তান। কিন্তু তাঁরা ছিলেন পিতামাতাদের চাইতে উন্নত। বোধহয় এজন্যেই সন্তানদের সম্পর্কে টাইটানদের মনে ছিল ভয়। ক্রমে এ-সন্দেহ শত্রুতায় পরিণত হল, আর এক সময় শুরু হয়ে গেল দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে তুমুল লড়াই। এক যুগ ধরে এ লড়াই চলল। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের নতুন শক্তির কাছে দৈত্যদের পরাজয় হল। দেবতারা লাভ করলেন সকল ক্ষমতা। অলিম্পাসের চূড়ায় স্থাপিত হল তাঁদের আনন্দ ঘেরা স্বর্গলোক।

কিন্তু যতই দিন যায় দেবতারা অমনোযোগী হয়ে উঠলেন পৃথিবী সম্পর্কে। মেঘের ওপারে বাস্ করে মাটির খবর কে রাখে? পৃথিবীর যে এক ক্ষুদ্র জীব মানুষ, তার সম্পর্কে তাঁরা হয় উদাসীন, না হলে নিষ্ঠুর। দেবতাদের এই নির্মম ব্যবহারে মানুষের জীবন ক্রমে দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

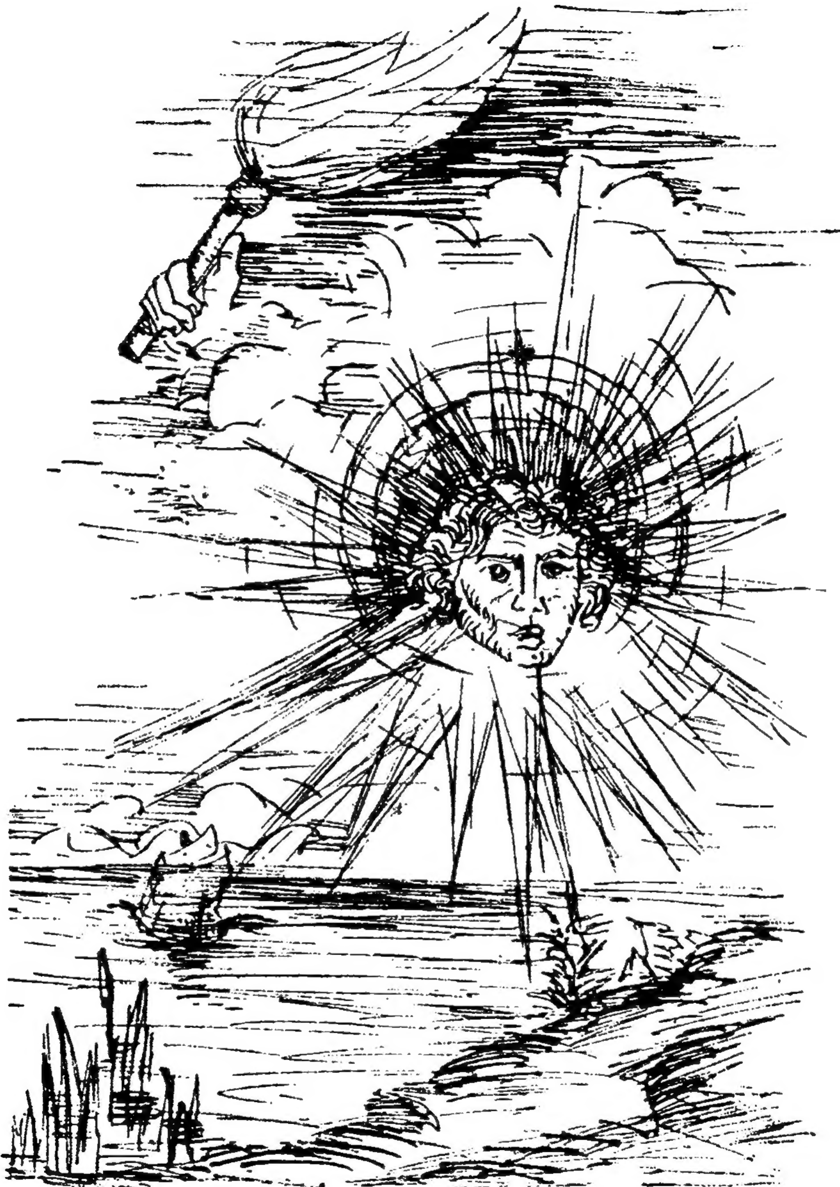
প্রকৃতির এক অসহায় জীব মানুষ। সিংহের শক্তি, হরিণের গতি, পাখীর স্বাধীনতা তার নেই। খাদ্য সংগ্রহ করতে সে সারাদিন ব্যস্ত ; আত্মরক্ষার জন্যে তার সারাক্ষণ ছুটোছুটি। জঙ্গলে, মাঠে, গুহায়, কোটরে কষ্টেসৃষ্টে সে জীবন ধারণ করে।

দেবতাদের উদাসীনতায় মানুষের এই দুর্গতির ছবি দেখে একজনের কিন্তু মন বড় আকুল হল। তাঁর নাম প্রমিথিউস। প্রমিথিউস্ আসলে ছিলেন একজন টাইটান্। কিন্তু প্রমিথিউস্ নামের অর্থ 'ভবিষ্যৎদৃষ্টি' ; ভবিষ্যতের সব কিছু ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দৈত্য-দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধে ভবিষ্যৎ ছিল উন্নততর দেবতাদের পক্ষে। তাই তিনি দেবতাদের পক্ষ নিলেন আপন জ্ঞাতির বিরুদ্ধে। তাঁর সহায়তায় দেবতারা যুদ্ধে জয়ী হলেন। পরবর্তীকালে প্রমিথিউস কিন্তু তাঁদের আচরণে নিরাশ হলেন। মানুষের প্রতি দেবতাদের নির্মম ব্যবহারে তিনি আর নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারলেন না। চিন্তা করতে লাগলেন কি করে মানুষকে তার দুরবস্থা থেকে রক্ষা করা যায়; কি করে ফুটিয়ে তোলা যায় তার অন্ধকার জীবনে আশার আলো।

অনেক ভেবে ভেবে প্রমিথিউস্ স্থির করলেন, মানুষের জন্য তিনি নিয়ে আসবেন 'আগুন', আর এ আগুনই ঘুচাবে তার জীবনের সকল অভিশাপ। তখন পর্যন্ত এ আগুন ছিল কেবল দেবতাদের অধিকারে, তাঁদের শক্তির প্রধান উৎস। দেবরাজ জুপিটার আগুনের তৈরী বজ্রের সাহায্যে শাসন করতেন সমস্ত সৃষ্টি!

প্রমিথিউস ঠিক করলেন, তিনি সূর্যদেব এপোলোর আগুনের রথ থেকে একটি শিখা চুরি করে আনবেন মানুষের জন্যে। একদিন তিনি সত্যি সত্যি বের হলেন এই

দুঃসাহসিক অভিযানে। তাপ-বিদীর্ণ, আলো-বিচ্ছুরিত সেই আগুনের রথ থেকে তিনি ধরিয়ে নিলেন একটি মশাল, আর সবার অলক্ষ্যে তা বয়ে নিয়ে এলেন পৃথিবীতে। লেলিহান, দীপ্ত সেই আলোর বর্তিকাটি প্রমিথিউস্ যখন মানুষের হাতে তুলে দিলেন, তখন তার জীবনের দিগন্তে যেন এক নতুন সুর্যোদয় ঘটল।



আগুন পেয়ে মানুষ হয়ে উঠল নব বলে বলীয়ান। ক্রমে ক্রমে সে আবিষ্কার করল এর নানা রকম ব্যবহার। আগুন দিয়ে সে তৈরী করল অস্ত্রশস্ত্র আর হাতিয়ার। এর ফলে সমস্ত জীবজগৎ হল তার ক্ষমতার অধীন। আগুনের সাহায্যে সে তৈরী করল

২—

চাষবাসের উপকরণ : লাঙ্গলের ফলা, কোদাল, কাস্তে এতে তার জীবন ধারণ সহজতর হল। আগুন জ্বালিয়ে সে শীত নিবারণ করল; আগুনে ঝলসে, রেঁধে সে তৈরী করল বিভিন্ন সুখাদ্য। যন্ত্রপাতি, আসবাব—নানা কিছু তৈরী করে ক্রমে মানুষ হয়ে উঠল পৃথিবীর সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী জীব। মানুষ সুখী, সভ্য জীবনের পথে অগ্রসর হল।

কিন্তু এতকালের একচেটিয়া অধিকারে হাত পড়ায় দেবতারা প্রমিথিউসের ওপর দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন তাঁর ধৃষ্টতার জন্যে। দেবরাজ জুপিটারের আদেশে প্রমিথিউস্‌কে নিয়ে যাওয়া হল সুদূর ককেসাস্ পর্বতে। সেখানে কঠিন শৃঙখলে তাঁকে বাঁধা হল পর্বতের গায়ে। দিনরাত তুহিন বাতাস আর বরফের ঝড় বয়ে চলল তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে। জুপিটারের পাঠানো এক বিরাটকায় ঈগল প্রতিদিন এসে তাঁর পাকস্থলী চিরে রক্ত পান করে যেতো। প্রতি রাত্রিতে এই ক্ষত সেরে উঠত; কিন্তু পরের দিন চলত একই যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি। এমনি করে বয়ে চলল যুগের পর যুগ।

জুপিটারের শাস্তির অসহায় শিকার হলেও প্রমিথিউসের হাতে কিন্তু ছিল এক গোপন অস্ত্র। ভবিষ্যতের ইশারা পেয়ে দেবতা ও দৈত্যদের লড়াইয়ে তিনি দেবতাদের পক্ষ নিয়েছিলেন; তাতে জয়ী হয়েছিলেন দেবতারা। কিন্তু কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীকালে তিনি আরো জানতে পারলেন, বাবার মত দেবরাজ জুপিটারেরও একদিন পতন হবে তাঁর নিজেরই এক সন্তানের হাতে। তাই প্রমিথিউসের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলেও জুপিটার বুঝতে পারলেন, তাঁর জীবনকাঠি আছে প্রমিথিউসের হাতে। কেবল প্রমিথিউস্‌ই তাঁকে বলে দিতে পারেন, কি করে তিনি এড়াতে পারবেন তাঁর শেষ বিপর্যয়।

জুপিটারকে তাই শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতেই হল। প্রমিথিউসের কাছে থেকে গোপন সংবাদ লাভের বিনিময়ে তিনি রাজি হলেন তাঁকে মুক্ত করে দিতে।

চুক্তির শর্ত অনুসারে জুপিটারের নিজের ছেলে মহাবীর হারকিউলিস্ অনুমতি পেলেন প্রমিথিউসকে মুক্ত করে আনবার। হারকিউলিস্ তখন একের পর এক দুঃসাহসিক অভিযানে রত। এক সময়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন ককেসাস্ পর্বতে। সেখানে এক কঠিন শক্তি-পরীক্ষায় তিনি পরাজিত করলেন দেবরাজের পাঠানো নৃশংস ঈগলকে; আর তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন তাঁর অস্ত্রের ঘায়ে। তারপর তাঁর ভীমবাহু প্রয়োগ করে তিনি ছিঁড়ে ফেললেন পাথরের ভারী শৃঙ্খল। যুগ-যুগান্তের যন্ত্রণার শেষে মুক্ত হলেন প্রমিথিউস্। খুশীর হিল্লোল বয়ে গেল সমস্ত পৃথিবীতে !

এমনিভাবে মহাবীর হারকিউলিস্ লাভ করলেন মৃত্যুহীন খ্যাতি; আর জয় হল মুক্তি-পূজারী, মানব-বন্ধু, অগ্নিবাহক প্রমিথিউসের।

প্যান্ডোরার কৌটো

প্রমিথিউস্ দেবতাদের কাছে থেকে আগুন লুকিয়ে এনেছিলেন মানুষের জন্যে। এজন্য জুপিটার কঠোর শাস্তি দিলেন প্রমিথিউস্‌কে। কিন্তু আগুন মানুষের কাছে রয়েই



গেল, আর ক্রমে সুখী, সমৃদ্ধিশালী করে তুলল তার জীবন। মানুষকে জব্দ করার জন্যে দেবতারা তাই এক অভিনব ফন্দি আঁটলেন।

একে একে সকল দেবতাই এ কাজে অংশ গ্রহণ করলেন ঃ তাঁরা তিল তিল করে সকল সৌন্দর্য মিশিয়ে সৃষ্টি করলেন অনিন্দ্যসুন্দরী এক রমণী—নাম তার প্যান্‌ডোরা। স্বাস্থ্য, রূপ, লাবনীতে কানায় কানায় পূর্ণ করে এই নারীকে তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন মানুষের সংসারে, তার জীবনের সঙ্গিনী হতে। সঙ্গে উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন সুন্দর একটি কৌটো। অপরূপ কারুকার্যময় এই মঞ্জুষাটি দেখলেই মন কেড়ে নেয়। কিন্তু দেবতাদের কঠোর নির্দেশ ঃ এক নিমেষের জন্যও যেন কৌটোটি না খোলা হয়!

পৃথিবীতে এসে প্যান্‌ডোরা ঘর বাঁধলো মানুষের সঙ্গে। সাথে নিয়ে আসা কৌটোটি সে সযত্নে তুলে রেখে দিল এক কোণে। কিন্তু যতই দিন যায়, কৌটোটির ভেতরে কি লুকনো আছে, তা দেখবার জন্যে কৌতূহল তার ক্রমে বাড়তেই লাগল। শেষে এক দিন তার ভয়ানক ইচ্ছে হল, একবার খুলে দেখে কৌটোর ভেতরে কি আছে। আর এক অসতর্ক মুহূর্তে ঢাকনাটি সে খুলেও ফেলল!

খোলা মাত্রই কিন্তু প্যান্‌ডোরা বুঝতে পারল কি নিদারুণ ভুল সে করেছে। কৌটোর ভেতর থেকে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী করে বেরিয়ে এল নানা বিভীষিকাময় বস্তু ঃ বাদবিসংবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ, ঈর্ষা, ভয়, যন্ত্রণা, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু! এদের কালো কুৎসিত ভয়ঙ্কর রূপ দেখে প্যান্‌ডোরা শিউরে উঠল। এক মুহূর্ত দেরী না করে সে কৌটোর মুখটি আবার এঁটে দিল। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেছে। ছাড়া পেয়ে নানা অশুভ শক্তি মানুষের জীবনকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। রোগশোক, হানাহানি, দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের জীবন হল আচ্ছন্ন। মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে প্যানডোরা যখন কৌটোটি আবার বন্ধ করে দিল, তখন তার তলায় পড়ে থাকল একটি মাত্র জিনিস ঃ সে হচ্ছে—'আশা'।

তাই মানুষের যতই দুরবস্থা হোক, যতই তার ওপরে নেমে আসুক ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখশোক, যতই অসহনীয় হোক তার জীবন, তবুও তার জন্যে অবশিষ্ট থাকে কোথাও না কোথাও, কোন না কোনভাবে, একটুখানি আশা।

ডিউকালিয়ন ও পীরা

সৃষ্টির পর থেকে নানা সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন বয়ে চলল। কিন্তু যতই দিন যায়, সমাজ-সংসারে অন্যায় আর অবিচার ক্রমে বাড়তেই থাকে। শেষে এমন সময় এল, যখন সমস্ত পৃথিবী পাপে ছেয়ে গেল। চারদিকে শুধু হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি আর কুটিলতা। সম্পত্তির লোভে ছেলে পিতার মৃত্যু কামনা করে, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসায়! স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের শত্রু! দয়ামায়া, স্নেহ-ভালোবাসা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল। অবস্থা দেখে দেবতারা একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। রইলেন শুধু এ্যাস্ট্রিয়া (নিষ্পাপতা)। সবার শেষে তিনিও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন অন্য জগতে!

রেগে দেবরাজ জুপিটার চাইলেন তাঁর বজ্রের আঘাতে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু জ্বলন্ত পৃথিবীর লেলিহান শিখায় স্বর্গেরও ক্ষতি হতে পারে, এই ভেবে তিনি



নিরস্ত্র হলেন। তাই তিনি সেখানে পাঠিয়ে দিলেন দারুণ এক প্লাবন। মেঘ-উড়িয়ে-নেওয়া উত্তরে বাতাসকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দক্ষিণে বাতাসকে ছেড়ে দেওয়া হল। নিমেষে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল ঘন কালো মেঘে। আর শুরু হল প্রচণ্ড বর্ষণ। মেঘ-চালনা-কারী জুপিটারের সঙ্গে যোগ দিলেন তাঁর ভাই সমুদ্রদেব নেপচুন্। তাঁর আদেশে সমুদ্র-নদীনালা কূল ছাপিয়ে চারদিক থেকে প্লাবিত করে দিল সমস্ত স্থলভাগ!

মুহুর্মুহু বাড়তে লাগল পানি। একে একে সকল জনবসতি তলিয়ে গেল, আর নিশ্চিহ্ন হল সমস্ত জনপ্রাণী। থৈ থৈ ঢেউয়ের ওপর মাথা তুলে থাকল কেবল পারনেসাস্ পাহাড় আর তার চূড়ায় প্রাণ নিয়ে বেঁচে রইলেন শুধু দু'জন মানুষ: ডিউকালিয়ন ও তাঁর স্ত্রী পীরা। সমস্ত পৃথিবীতে ওঁরাই শুধু ছিলেন একান্ত নিষ্পাপ। পাপীদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তবে থামল জুপিটারের রাগ।

দেবরাজ এবার আদেশ করলেন উত্তরে বাতাসকে ছেড়ে দিতে—ছাড়া পেয়েই তারা মেঘদেরকে ছিন্নভিন্ন করে পরিষ্কার করে ফেলল আকাশ। নেপচুন্ আদেশ করলেন তাঁর ছেলে ট্রাইটন্‌কে তার শঙ্খের ধ্বনিতে সমুদ্রের পানিকে আবার আগের খাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

মহা প্লাবনের পর ডিউকালিয়ন ও পীরা বড় একা বোধ করলেন। কি করে এই বিশাল পৃথিবী আবার জনপ্রাণীতে ভরে উঠবে, এই হল তাঁদের চিন্তা। শেষে মন্দিরে গিয়ে তাঁরা দু'জনে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেন। তাঁদের আকুতির জবাবে দৈববাণী হল: মাথায় কাপড় দিয়ে পোশাক আগলা করে তোমরা তোমাদের মায়ের হাড় পেছন দিকে ছুঁড়ে মার। প্রথমে তাঁরা বুঝতে পারলেন না এই অদ্ভুত নির্দেশের অর্থ কি! কিন্তু একটু চিন্তা করতেই তাঁদের মনে হল, পৃথিবীই তো তাঁদের মা, আর শিলা পাথর তাঁর হাড়। তাই তাঁরা আদেশ মত সামনে যেতে যেতে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। ছোঁড়ামাত্রই তাঁরা দেখতে পেলেন, পাথরগুলি লাভ করছে ঠিক মানুষের আদল: ডিউকা-লিয়নের ছোঁড়া পাথরগুলি পুরুষ ও পীরার ছোঁড়া পাথরগুলি নারীতে পরিণত হতে থাকল।

এমনি করে শীগগিরই পৃথিবী আবার জন-কোলাহলে পূর্ণ হল।

দুরন্ত ছেলে ফিটন্

গ্রীকদের সূর্যদেবতার নাম এপোলো। তাঁর দুরন্ত ছেলে ফিটন্। যেমন তার শক্তি, তেমনি তার তেজ। যতই সে বড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই সে হয়ে উঠল নির্ভয় ও দুঃসাহসী। কিছুতেই সে পিছু হইবে না, আর কোন কিছুতেই তার হার মানা নেই।

ফিটন্ দেখত, প্রতিদিন ভোরে তার বাবার আলোর রথ পুব দিক থেকে যাত্রা শুরু করে সারাদিনে আকাশ পথ পাড়ি দেয়। এর আলোর ঝরণা তার চোখকে ঝলসে দেয়। একদিন সে বায়না ধরল, সূর্যের রথ একদিন সে চালিয়ে দেখবে। নইলে তার খেলার সাথীরা তো স্বীকারই করতে চায় না, সে এপোলোদেবের সন্তান!

বাবা অনেক চেষ্টা করলেন ফিটন্‌কে এই দুঃসাহসিক অভিযান থেকে বিরত রাখতে। কারণ, আকাশের নিঃসীম পথ বড় ভয়াল। গ্রহনক্ষত্র বাঁচিয়ে, সকালের চড়াই আর বিকেলের উৎরাইয়ের ঝুঁকি নিয়ে, নির্বিঘ্নে সন্ধ্যাসাগরে সূর্যের আগুনের রথ নামিয়ে নেওয়া চাট্টি খানি কথা নয়। কিন্তু ফিটন্ তার উদ্দেশে অটল। এপোলো-দেবকে তাই শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হল তার কথায়। আর সত্যিই একদিন ঘোড়া সাজিয়ে বাবার রথে আকাশ পথে যাত্রা করল ফিটন্।



পুব আকাশের বাঁক ধরে ওপরে উঠল অগ্নিরথ। আঁধার ফিকে হয়ে ক্রমে ঝলমলিয়ে উঠল দিগন্ত। আলোর ছোঁয়ায় জেগে উঠতে লাগল মাট-ঘাঠ লোকালয়। কিন্তু বেশীক্ষণ না যেতেই বোঝা গেল, রথ চালাবার অভিজ্ঞতা খুব কমই আছে ফিটনের। তার আনাড়ি হাতের স্পর্শ পেয়ে শীঘ্র ঘোড়ারা সব বেপরোয়া হয়ে উঠল। বল্গাহারা হয়ে তারা ছুটল দিগ্বিদিক। কক্ষ থেকে ছিটকে পড়ে এক সময়ে সূর্য এত কাছে নেমে এল পৃথিবীর যে নদী-হ্রদের সমস্ত পানি গেল শুকিয়ে, মাটি ফেটে চৌচির! ইথিওপিয়ার লোকেদের গায়ের রং পুড়ে কালো হয়ে গেল; লিবিয়ার প্রান্তর মরুভূমি হয়ে উঠল। নীল নদী ভয়ে বালিতে গিয়ে মুখ লুকালো। আর একটু হলেই সমস্ত পৃথিবী দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আর কি!

আলো-বিচ্ছুরিত তামাটে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেবরাজ জুপিটার প্রমাদ গণলেন। উপায়ান্তর না দেখে তাঁকে এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হল। তাঁর এক বজ্রের আঘাতে ফিটন্‌কে হত্যা করে দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করলেন পৃথিবীকে। ফিটনের জ্বলন্ত দেহ ছিটকে গিয়ে পড়ল এরিডেনাস্ নদীতে!

দামাল ছেলে ফিটনের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে ব্যথায় মুহ্যমান হল বিশ্ব-প্রকৃতি। জলপরীরা তার মৃত দেহকে সমাহিত করল এরিডেনাস্ নদীরই শীতল পানিতে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে 'হিলিয়াড্' নামে ফিটনের বোনেরা এল তার সমাধির পাশে বিলাপ করতে। তাদের বুকফাটা কান্নায় দেবতাদের মনে করুণা হল। তাঁরা তাদেরকে রূপান্তরিত করে দিলেন এক সারি পপ্‌লার গাছে।

হিলিয়াড্‌দের চোখের পানি জমে ঐ গাছের ডালে ডালে তৈরী হয় এক রকম হরিদ্রাভ অম্বর, যা প্রচুর পাওয়া যায় এরিডেনাস্ নদীর তীরে তীরে!

মাইডাস্ রাজার নির্বুদ্ধিতা

সেকালে মাইডাস্ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল অঢেল ধনদৌলত। কিন্তু তাতে তাঁর কোন তৃপ্তি ছিল না। যত ছিল তাঁর সোনাদানা, তার চাইতে বেশী ছিল লোভ। কি করে তিনি ধনী হবেন—আরো, আরো, এত ধনী যে পৃথিবীতে সবাইকে ছাড়িয়ে—এই ছিল তাঁর দিনরাত্রির ভাবনা।

একবার ফূর্তির দেবতা ব্যাকাসের এক বন্ধুর সেবা করে তিনি তাঁকে খুশী করে ফেললেন। দরাজ-দিল ব্যাকাস্ তাঁকে একটি বর দিতে চাইলেন। মাইডাস্ দেখলেন এবারেই তাঁর সুযোগ। সময় নষ্ট না করে চেয়ে বসলেন, তিনি যা স্পর্শ করবেন, তাই যেন সোনা হয়ে যায়। ব্যাকাস্ তাতেই রাজি; কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, মাইডাস্ অন্য কিছু চাইলেই বোধহয় ভালো করত।

মাইডাস্ কিন্তু বেজায় খুশী। দেবতার দেওয়া ক্ষমতা পরখ করার জন্য ওক গাছের একটি ডাল ধরতেই তা নিমেষে সোনা হয়ে গেল! একখণ্ড পাথর হাতে তুলে নিতে তা-ও সোনা! মাটির ঢেলা, তা-ও!! একটি আপেল, সেটি ও!!!

আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাইডাস্ বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। আর তাতে আমন্ত্রণ করলেন দেশের গণ্যমান্য সকল লোককে।

কিন্তু খেতে বসেই মাইডাস্ খটকায় পড়লেন। খাবারের থালাতে যে-ই তিনি হাত দিয়েছেন, অমনি তা সোনা হয়ে গেল। তারপর মাংস, ফলমূল যা-ই তিনি হাতে তুলে নেন, তাই সোনা। এমন কি পিপাসার পানি পর্যন্ত সোনার টুকরো হয়ে তাঁর মুখে আটকে রইল!

বেশীক্ষণ না যেতেই মাইডাস্ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, তাঁর আশীর্বাদ এক নিদারুণ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মরিয়া হয়ে তিনি যাই করতে গেলেন, তাতে তাঁর চার পাশে সোনার পাহাড় জমাতে লাগল, কিন্তু প্রাণে কোন শান্তি নেই। অসহায়ের মতো তিনি তাঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে ধরতে গেলেন। স্পর্শ মাত্র সোনার মূর্তি হয়ে তারা তাঁর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ক্ষোভে, দুঃখে, অনুতাপে মাইডাস্ তার সোনা ঝলমল হাত তুলে ব্যাকাসের কাছে মিনতি করলেন, তাঁর বর যেন ফিরিয়ে নেওয়া হয়। দেবতার ইচ্ছায় তাই হল।

এমন একটি অভিজ্ঞতা লাভ করার পর মাইডাস রাজার জীবনে এল এক বিরাট পরিবর্তন। ধনসম্পত্তি, জাঁকজমক সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি ধর্মকর্মে মন দিলেন, আর ভক্ত হয়ে দাঁড়ালেন অরণ্যদেব প্যানের। কিন্তু এবারও ঘটল এক বিপর্যয়।



একবার সূর্যদেব এপোলো আর অরণ্যদেব প্যানের মধ্যে সঙ্গীতের এক প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতা-সভায় রাজা মাইডাসও উপস্থিত ছিলেন; আর তার ওপরই ভার পড়ল বিচারের। কিন্তু এপোলোদেবের বীণার ধ্বনি প্যানের খাগড়ার বাঁশীর চাইতে অনেক বেশী মধুর হওয়া সত্ত্বেও মাইডাস রাজা মাথা নেড়ে রায় দিলেন প্যান দেবতার পক্ষে। এপোলোদেব মহা রুষ্ট হলেন তাঁর কানের বিচার-শক্তির

ওপর, আর অভিশাপ দিয়ে তাঁর কানকে রূপান্তরিত করে দিলেন লম্বা দুটো গাধার কানে!

বিপাকে পড়লেও মাইডাস কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন না। মস্ত একটা পাগ্‌ড়ি দিয়ে কান দুটো ঢেকে তিনি রাজকার্য চালাতে লাগলেন। এমনি করে বেশ কিছু দিন কেটে গেল। বাইরের অন্য কেউ তো টের পেল না, কিন্তু চুল কাটতে এসে নাপিত ভায়া তাঁর গাধার কান দেখে ফেলল। রেগে রাজা হুকুম করলেন, ঘুণাক্ষরেও একথা কেউ যেন জানতে না পারে, তাহলে তার গর্দান যাবে।

এমন একটা গুরুতর ব্যাপার তার মনের মধ্যে পুষে রাখতে যেয়ে নাপিত বেচারা কিন্তু হিমসিম খেয়ে গেল। যতই দিন যায়, কাউকে না কাউকে বলতে না পারলে তার যেন আর শান্তি নেই। শেষে অপারগ হয়ে মাঠের মধ্যে একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে মুখ লাগিয়ে সে ফিসফিস করে বলল, 'মাইডাস রাজার গাধার কান!' বলেই সে এক বিরাট স্বস্তি বোধ করল। আর সযত্নে গর্তটি আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে বাড়ি ফিরল।

কিছুদিন পরেই কিন্তু মাঠের ঠিক ওই যায়গাটি দিয়ে একটি গাছ জন্মাল। গাছটির লম্বা লম্বা ডাল, আর সরু সরু পাতা। যখনই সে পাতার ভেতর দিয়ে বাতাস বয়, ফিস-ফিস করে আওয়াজ ওঠে, 'মাইডাস রাজার গাধার কান!' কৌতূহলী হয়ে একে একে দেশের সকল লোক একথা শুনে যেতে লাগল।

এমনি করে মাইডাস রাজার লুকানো কানের কথা সর্বত্র কানাকানি হয়ে গেল।

একো আর নারসিসাস্

একো (প্রতিধ্বনি) নামে ছিল এক অপ্সরী। ছিমছাম তার দেহ, আর হাল্কা তার পা। বনে, পাহাড়ে, ঝর্ণায় রাতদিন তার আনাগোনা। আর অবসর ছিল না তার মুখের--- সারাক্ষণ শুধু কথা আর কথা। সব কিছুর জবাব দেওয়া তার চাই-ই, আর সব কথার শেষ কথা তার।



এই কথার জন্যে একবার দেবতাদের রানী জুনো একোর ওপর ভারী বিরক্ত হলেন। রেগে তিনি তার জিভের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিলেন; রাখলেন শুধু একটি---সে তার জবাব দেবার। শেষ কথাটি সব সময়ই একো বলবে, কিন্তু বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না প্রথমে।

বনের পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন একো দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দর এক যুবা পুরুষ। নাম তার নারসিসাস্। যেমন দীর্ঘ, ঋজু তার দেহ, তেমনি ফুলের মত সুন্দর তার মুখটি। দেখেই একো তাকে ভালোবেসে ফেলল।

একো ছায়ার মত তার পেছন পেছন ফেরে। কিন্তু একটি কথাও তার মুখ দিয়ে সরে না। তার করুণ চাহনি নারসিসাসের কাছে কিছুই মনে হয় না। একদিন নারসিসাস্ তাকে খুব কাছে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে এখানে? বিরক্তি-ভরা এ-প্রশ্নের জবাবে একো শুধু বলতে পারল, এখানে।

—তোমার কি চাই?

—চাই!!

—কেন তুমি বারবার আমার কাছে আসো?

—কাছে আসো!!!

একোর আকুতিময় এ-সব কথাকে নিছক পুনরাবৃত্তি মনে করে নারসিসাস্ নিষ্ঠুর ভাবে তাকে ছেড়ে চলে গেল। লজ্জায়, দুঃখে একো পালিয়ে গেল এক নির্জন গুহায়। সেখানে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করল। দিনে দিনে হতাশায়, শোকে, তিল তিল করে শেষ হয়ে গেল একো। শুধু তার হাড়গুলো ছড়িয়ে রইল বনের ধারে এখানে ওখানে পাথর হয়ে। একটি জিনিসই শেষ পর্যন্ত তার বেঁচে থাকল, সে তার কণ্ঠ।

বন-পাহাড়ে আজও তোমরা একোর কণ্ঠ শুনতে পাও কথা বললেই। সেই কণ্ঠ দিয়ে এখনও সে ডাকের জবাব দিয়ে যায়; আর পুরনো অভ্যাসে বলে যায় তার শেষ কথা।

বেশী দিন না যেতেই নারসিসাস্ কিন্তু পেল একোর প্রতি তার নিষ্ঠুরতার যোগ্য প্রতিফল।

বনের পথে ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে একদিন এক ঝর্ণার ধারে আসতেই সে দেখতে পেল নিজের প্রতিবিম্ব। ডাগর একটি ফুলের মত মুখটি দেখেই নার-সিসাস মুগ্ধ হয়ে গেল। সে তাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়াল। কিন্তু পানিতে হাত লাগতেই ছবিটি ভেঙে ভেঙে কোথায় হারিয়ে গেল। একটু পরে পানি স্থির হতে আবার ফিরে এল সেই ছবি। সে যতক্ষণ আছে, মূর্তিটিও আছে। এত কাছে তবু নাগালের বাইরে,—ধরতে গেলেই যায় হারিয়ে।

নাসসিসাস সব কিছু ভুলে দিনের পর দিন নিজের ঐ প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। এভাবে একোর মত সে-ও পলে পলে গেল নিঃশেষ হয়ে। তার এই অবস্থা দেখে দেবতাদের মনে করুণা হল। তাঁরা তাকে রূপান্তরিত করে দিলেন বিচিত্র বর্ণ একটি ফুলে!

এ-ফুলটির নাম নারসিসাস্, পানির ধারে জন্মায়, আর নিজের প্রতিবিম্বের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকে দিনের পর দিন!

কিউপিড্ ও সাইকি



গ্রীক রূপকথায় সৌন্দর্য ও ভালোবাসার দেবী ভিনাস্। তাঁর কিশোর পুত্র কিউপিড্ —তাকে বলা হয় প্রেমের দেবতা। চঞ্চল এ-দেবশিশুর পিঠে ডানা, হাতে তীরধনু, আর চোখ দুটো অন্ধ। ভালোবাসার কোন বয়স নেই, তাই কিউপিড চির-কিশোর। ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে বিচার-বুদ্ধি, কিউপিড তাই অন্ধ। আর ভালোবাসার কাছে দূর কখনো দূর নয়, তাই সে ডানা মেলে চলে যায় সেখানে তার খুশি।

কিউপিডের তীরের আঘাত যার বুকে গিয়ে লেগেছে, সে ভালোবাসার অসহায় শিকার।

এক সময়ে সাইকি নামে ছিল এক রাজকুমারী। তিন বোনের মধ্যে সে কনিষ্ঠা, কিন্তু রূপে সবার সেরা। যতই সে বড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই উপচে পড়তে লাগল তার রূপ-লাবণী। তার রূপের কথা গল্পের মত ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে। দেশ-বিদেশ

থেকে লোকে আসতে লাগল তাকে দেখতে। এমন কি ভিনাসের মন্দির শূন্য হয়ে লোকের ভিড় জমতে লাগল তার রাজপ্রাসাদে।

ক্রমে দেবী ভিনাসের কানে গিয়ে পৌঁছল এ-খবর। শুনে তিনি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ছেলে কিউপিড্‌কে হুকুম করলেন, উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে সাইকিকে। এমন একটি বর জুটিয়ে দিতে হবে তাকে যেন সারাটি জীবন সে জ্বলে-পুড়ে মরে।

মায়ের আদেশে কিউপিড চলল তার তীরধনু নিয়ে। কিন্তু সাইকির সামনে আসতেই তার রূপ দেখে সে এমন হকচকিয়ে গেল যে আচমকা খোঁচা খেল তার নিজের তীরেই! সঙ্গে সঙ্গে সে ভালোবেসে ফেলল সাইকিকে গভীর ভাবে।

এদিকে দেবীর অভিশাপে সমাজে সাইকির কোন ঠাঁই নেই। একে একে বোনদের বিয়ে হয়ে গেল; কিন্তু সবার সেরা রূপ নিয়েও তার আর বর জোটে না। অনেক প্রতীক্ষার পর এক দৈব আদেশ পাওয়া গেল ঃ সাইকিকে নিয়ে রেখে আসতে হবে এক পাহাড়ের ওপর একাকী, সেখানে তাকে গ্রহণ করবে অজানা এক প্রাণী!

দুরু দুরু বক্ষে একদিন সাইকি যাত্রা করল সে পাহাড়ের উদ্দেশে। চূড়ায় পৌঁছে সে যখন অপেক্ষা করছে, তখন পবন-দেব জেফিরাস্ আলগোছে তাকে তুলে নিয়ে নামিয়ে দিল এক অপরিচিত নির্জন যায়গায়। নীলিম বনভূমির মাঝখানে এক সুরম্য প্রাসাদ। সেখানে থরে থরে সাজানো নানা উপাচার। অদৃশ্য পরিচারিকারা সারাক্ষণ তার সেবায় ব্যস্ত। দিনের সকল আয়োজনের শেষে রাত্রিতে সাইকি যখন ঘুমের আবেশে বিভোর, তখন অন্ধকারের আবরণে তার কাছে এসে উপস্থিত হল রহস্যময় এক ব্যক্তি। পরিচয় দিল, দৈববাণীতে বলে দেওয়া সেই তার স্বামী। অন্ধকারে তার আদল বোঝা যায় না, কিন্তু কি মধুর তার কণ্ঠ, কি আকুল করা তার কথা। সাইকি মনে প্রাণে তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করল।

এমনি ভাবেই কাটতে লাগল দিনের পর দিন। কিন্তু গহন বনের সেই নির্জন অট্টালিকার সব কিছুকে ঘিরে রইল রহস্যের এক যবনিকা। অন্ধকারের আড়ালে যে স্বামী প্রতিদিন তার কাছে আসে, ভোরের আলো না ফুটতেই সে আবার কোথায় চলে যায়। সাইকি তাকে দেখতে পায় না তার দু'চোখ দিয়ে। শুধু যে সে দেখতেই পায় না তাই নয়, তার অদৃশ্য স্বামী তাকে পইপই করে বারণ করে দিয়েছে, সে যেন তাকে দেখবার চেষ্টাও না করে কোনক্রমে।

যতই দিন যায়, ভেতরে ভেতরে কিসের যেন এক অভাব বোধ করতে থাকে সাইকি। সারাদিন একাকী থাকতে তার আর ভালো লাগে না। শেষে একদিন স্বামীর কাছে মিনতি করল, তার বোনেরা তার কাছে এসে কয়দিন থাকবে। অনুরোধে স্বামী রাজি হল।

বোনদের কিন্তু সাইকির সৌভাগ্য দেখে ভেতরে ভেতরে দারুণ জ্বলুনি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা – কোথাও কোন ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। যখন তারা জানতে পারল, সাইকি তার স্বামীকে নিজ চোখে কোনদিন দেখেনি, তখন তারা পেয়ে বসল। নিশ্চয়ই এর ভেতরে কোন কিন্তু আছে। হাতড়ে হাতড়ে তারা বের করল অতীতের সেই দৈববাণী ঃ সাইকির বিয়ে হবে আজব এক প্রাণীর সঙ্গে। নিশ্চয়ই অতি বিকট,

কালো, কুৎসিত তার স্বামী। নইলে এত লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরে কেন? এভাবে তো আর বেশী দিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। এরকম অজানা জন্তু থেকে কোন বিপদ আপদও তো হতে পারে। তারা তাই পরামর্শ দিল, আর দেরী নয়, তার স্বামীর আসল পরিচয় জানতেই হবে। সে রাত্রিতেই তার স্বামী যখন আবার আসবে, তখন যে করেই হোক, দেখতে হবে আসলে সে কি।

প্রথম প্রথম সাইকি বোনদের কথা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু শেষে তাকে মত দিতেই হল শুভাকাঙ্ক্ষী বোনদের প্রস্তাবে।

রাত্রি নামতেই সেদিন বিছানার পাশে লুকিয়ে রাখা হল একটি প্রদীপ। প্রতিদিনের মত সেদিনও তার স্বামী এল; আর সে যখন গভীর ঘুমে মগ্ন, তখন সাবধানে প্রদীপটি জ্বালিয়ে সাইকি দেখতে গেল তার মুখটি। কত সন্দেহ, কত রটনা, কত অপবাদ—সমস্তই মিথ্যে! কি অপরূপ তার স্বামী; দেহ কান্তিতে দেবতা বৈ কি? মুগ্ধ হয়ে আর একটু কাছে থেকে তাকে দেখতে যেতেই প্রদীপের এক ফোঁটা গরম তেল পড়ল তার মুখে। চমকে জেগে উঠল কিউপিড; আর নিমেষের বিস্ময় কাটিয়েই ডানা মেলে উড়ে পালাল জানালা দিয়ে।

তৎক্ষণাৎ সাইকি বুঝতে পারল কি বিষম ভুল সে করেছে। পাগলিনীর মত স্বামীর পিছু নিল সে, আর চীৎকার করে তাকে অনুরোধ করল ফিরে আসতে। কিন্তু সকল অনুনয়ই বৃথা হল। চলতে চলতে হঠাৎ কিসে আঘাত লেগে সাইকি হুমড়ি খেয়ে পড়ল কঠিন, শীতল মাটিতে। আর্ত চীৎকার করে সে মাফ চাইল তার কৃতকর্মের জন্য। কিন্তু তখন আর সময় নেই। চারদিকে তাকিয়ে সে দেখল সব শূন্য। কোথায় মিলিয়ে গেছে সেই উপবন, আর কোথায় সেই রাজপ্রাসাদ! চারদিকে মাঠ-ঘাট, নদীনালা, লোকালয়—তার সেই পুরনো, পরিচিত বাসভূমি!

স্বামীর সন্ধানে দিশেহারা হয়ে নানা যায়গায় ঘুরে বেড়াল সাইকি। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেল না। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সে এসে উপস্থিত হল ভিনাস দেবীর মন্দিরে। সুযোগ বুঝে এবার মনের ঝাল খুব করে ঝাড়লেন ভিনাস তার ওপর; আর চালাতে লাগলেন একটার পর একটা হুকুম। ফরমাস হল, তাঁর চত্বরে তাঁর প্রিয় কবুতরদের জন্যে রাখা যব গম জোয়ার বাজরার মেশানো স্তূপ থেকে দানাগুলোকে আলাদা আলাদা করে বেছে রাখতে হবে। এমন কাজ কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সাইকি তবুও তাই করতে বসল। কিন্তু কে যেন আড়াল থেকে মাঠের পিঁপড়েদের আদেশ করল সাইকিকে সাহায্য করতে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে পিঁপড়েরা দানাগুলোকে আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে রাখল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা পরিপাটি স্তূপগুলো দেখতে পেয়ে ভিনাস রেগে টং। এ নিশ্চয়ই তার নিজের কাজ নয়; নিশ্চয়ই অন্য কেউ তাকে লুকিয়ে সাহায্য করেছে, যাকে সে বরং কষ্ট দিয়েছে নিজের দোষে। এই বলে রাত্রির খাবারের জন্য এক টুকরো পোড়া রুটি ছুঁড়ে দিয়ে ভিনাস চলে গেলেন।

পরের দিন হুকুম হল, নদীর ওপারের প্রান্তরে যে বিরাট ভেড়ার পাল চড়ে বেড়ায় তাদের প্রত্যেকের গা থেকে কিছু কিছু লোম সংগ্রহ করে এনে দিতে হবে তাঁকে। অনুগত বৌএর মত সাইকি চলল তাই করতে। কিন্তু নদীর পারে যেতেই নদীর দেবতা তাকে

সাবধান করে দিল, উঠতি বেলায় ভেড়ার পাল যখন বেয়াড়া মেজাজে থাকে তখন সাইকি যেন তাদের মাঝখানে যেয়ে না পড়ে। বরং ভেড়ার পাল ঘরে ফেরার পর সাঁঝবেলায় নিরিবিলি সেখানে গিয়ে সে যেন লোম সংগ্রহ করে আনে। দিনের শেষে সাইকি যেয়ে দেখতে পেল, ভেড়ার পাল যেখান দিয়ে চরে বেড়িয়েছে, সেখানে ঝোপেঝাড়ে গাছপালায় গোছাগোছা ভেড়ার সোনালী লোম ঝুলছে। সযত্নে সেগুলো সংগ্রহ করে এনে পাট করে সে ভিনাস দেবীকে দিতে গেল। কিন্তু তাতে খুশী হওয়া দূরে থাক, আরো তেরিয়া হয়ে তিনি এবার তাকে বললেন, এতই যদি পার, তবে যাও না একবার ঘুরে এস পাতালপুরী থেকে। পাতালপুরীর রানী প্রসারপিনাকে বল, তেলের সেঁকা লেগে অসুস্থ ছেলেকে শুশ্রূষা করতে গিয়ে আমি যেটুকু রূপ হারিয়েছি, তার রূপ থেকে সেটুকু সে যেন আমাকে দিয়ে দেয়!

পাতালপুরীর যাত্রা, সে তো জীবনের শেষ যাত্রা। মৃত্যুর দুয়ার পার হয়েই কেবল সে পথে পা বাড়ানো যায়। হতভাগিনী সাইকি,—পথ সংক্ষেপ করতে এক উঁচু পাহাড়ের ওপরে গিয়ে দাঁড়াল, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে। কিন্তু কে যেন কোথা থেকে তাকে বারণ করল আত্মহত্যার বিষম পাপের পথ বেছে না নিতে। বলে দিল, কোন্ গোপন সুড়ঙ্গ, খাত পার হয়ে, পাতালের পাহারাদার কুকুর সারবেরাসকে এড়িয়ে, খেয়ার মাঝি কেরনকে তুষ্ট করে সে পৌঁছতে পারবে তার গন্তব্যে। আরো বলল, প্রসারপিনা যে কৌটোয় তাঁর রূপের কণিকা দিয়ে দেবেন, খবরদার, ভুলেও সে যেন তার ঢাকনাটি না খোলে।

কথা মত কাজ করে, দীর্ঘ বন্ধুর পথ পার হয়ে সাইকি সত্যিই একদিন পৌঁছল পাতালপুরীতে। সেখানে তার সব কথা শুনে প্রসারপিনা অভিভূত হলেন; তাকে দিয়ে দিলেন তাঁর রূপের একটি কৌটা!

এমন দুরূহ কাজে সফল হয়ে অনেক দিন পরে সাইকির মনে আশা হল, সে সত্যিই হয়তো আবার ফিরে পাবে তার প্রিয়তমকে। কিন্তু এত দিনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও পথের ক্লান্তিতে তার রূপের ওপর কালি পড়েছে। এমনি ভাবে স্বামীর কাছে গেলে সে কি তাকে চিনতে পারবে, গ্রহণ করবে আগের মত? তার বড় সাধ হল, প্রসারপিনার রূপের সামান্য এক কণামাত্র যদি সে পেত। মুহূর্তের দুর্বলতায় সাবধান বাণী ভুলে কৌটোর ঢাকনাটি সে যেই খুলেছে, অমনি এক কাল ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সাইকি। তার অচেতন দেহ এলিয়ে পড়ল পথের ধারে!

কিন্তু এতদিনে কিউপিড তার ক্ষত থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে। মায়ের বারণ সত্ত্বেও জানালার ফোকর গলে সে সোজা চলে এল সাইকির কাছে। কাল ঘুম তার দেহ থেকে মুছে নিয়ে আবার কৌটোয় পুরে সে সাইকিকে নিয়ে উপস্থিত হল দেবরাজের কাছে। সেখানে সে জানাল তার করুণ আবেদন। জুপিটার তার হয়ে ভিনাসের কাছে অনুনয় করলেন। এতদিনে ভিনাসের মন টলল। দেবরাজের আদেশে তখনি সাইকিকে নিয়ে আসা হল দেবসভায়। সেখানে 'এম্ব্রোসিয়া' ও 'অমৃত' খেয়ে সে হল অমর; দেব-দেবীদের একজন।

অলিম্পাস্ পর্বতের এই নতুন দেবী আর কিউপিডের ভালোবাসার বন্ধন হল চিরন্তন!

৪—

আদি আবিষ্কারক ডিডেলাস্



সেকালে গ্রীসের এথেন্স শহরে ডিডেলাস্ নামে এক লোক বাস করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভারী বুদ্ধিমান। নানা রকম ফন্দি আর বিচিত্র খেয়াল সারাক্ষণ খেলে বেড়াত তাঁর মাথায়। অল্প দিনেই তিনি হয়ে উঠলেন কারিগরদের সেরা। লোকে বলে, কাঠ চেরার করাত আর কাঠ-কাটার কুড়াল তিনিই নাকি প্রথম তৈরী করেন। খোদাই করে মূর্তি গড়ার কাজও নাকি তাঁরই আবিষ্কার। ক্রমে দেখা গেল, সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে আর উদ্ভাবনী শক্তিতে তাঁর জুড়ি নেই সারা পৃথিবীতে।

এত বড় কুশলী হওয়া সত্ত্বেও ডিডেলাসের মধ্যে দেখা দিল কিছু মারাত্মক দোষ। ভেতরে ভেতরে তিনি হয়ে উঠলেন বেশ অহংকারী, আর দারুণ তাঁর মোহ জন্মাল খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে। কেউ তাঁকে ছাড়িয়ে যায়, একথা যেন তাঁর সহ্য হয় না। তাই ঈর্ষা-কাতর হয়ে এক সময় আপন ভাগ্নেকেই তিনি খুন করে বসলেন। এই পাপ কাজ তাঁর ওপর ডেকে আনল বিষম বিপদ। প্রানের ভয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হল। সাগর পাড়ি দিয়ে তিনি চলে গেলেন সুদূর ক্রীট্ দ্বীপে!

সে সময়ে ক্রীটের রাজা ছিলেন মাইনস্—এদেশের প্রাচীন রাজাদের মধ্যে সব চাইতে খ্যাতিমান। তাঁর রাজসভায় ছিল নানা গুণীর সমাবেশ। ডিডেলাসের পরিচয় পেয়ে মাইনস্ জাঁকজমক সহকারে তাঁকে গ্রহণ করলেন তাঁর রাজসভায়।

মাইনস্ ও ডিডেলাসের মধ্যে ক্রমে গড়ে উঠল এক মজার সম্পর্ক। মাইনসের মাথায় যেমন খেয়াল, ডিডেলাসের তেমনি বুদ্ধি! দুয়ে মিলে তৈরী হতে লাগল নতুন নতুন নানান জিনিষ। কিন্তু এ সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত হয়ে উঠল এক

মায়াকানন : নাম তার গোলক-ধাঁধা। গাছগাছালায় ঘেরা এই যায়গাটিতে কেবল পথ আর পথ—অসংখ্য গলি খুঁজি, বাঁক, মোড় আর চৌরাস্তা। এ বিষম যায়গায় একবার যে ঢুকেছে, তার আর রক্ষে নেই। দিশেহারা হয়ে সে কেবল চলতেই থাকবে। এই গোলক-ধাঁধার এক যায়গায় মাইনস্ রেখে দিলেন এক মানুষ-খেকো রাক্ষস—নাম তার মাইনোটর। পথহারা পথিক ঘুরতে ঘুরতে একসময় সামনে পড়ে যাবে এই মাইনোটরের; আর সে-ই হবে তার শেষ।

এক সময়ে এথেন্স রাজ্যের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল রাজা মাইনসের। এ-যুদ্ধে এথেন্সকে হারিয়ে দিয়ে মাইনস্ আদায় করলেন এক কঠিন শর্ত : প্রতি বছর সাত জন গ্রীক যুবক আর সাত জন যুবতীকে ভেট পাঠাতে হবে রাক্ষস মাইনোটরের খোরাক হিসেবে। বছরের পর বছর গ্রীক যুবক-যুবতীরা বরণ করে নিতে লাগল গোলক ধাঁধার এই করুণ মৃত্যু! নিজের আবিষ্কারে নিজ দেশবাসীর এই দুর্দশা দেখে ডিডেলাস মর্মাহত হলেন, তাঁর অনুতাপ হল নিজ উদ্ভাবনার এই অপব্যবহারের জন্য। তাই একবার যখন হতভাগ্য যুবক-যুবতীদের একজন হয়ে সেখানে উপস্থিত হল স্বয়ং এথেন্সের যুবরাজ মহাবীর থিসিউস্, তখন ডিডেলাস্ এক ফন্দি ঠাওরালেন বিপদের ঝুঁকি নিয়েও!

ভাগ্যও ডিডেলাসকে সহায়তা করল। ক্রীটে এসে পৌঁছা মাত্রই সুদর্শণ যুবক থিসিউস্‌কে দেখে ভালোবেসে ফেলল রাজকুমারী এরিয়াড্‌নি। এরিয়াড্‌নির মারফৎ ডিডেলাস্ গোপনে থিসিউসকে পাঠিয়ে দিলেন সুতোর একটি পুঁটলি ও তীক্ষ্ণধার একটি তরবারি। আর ভালো করে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে এগুলো ব্যবহার করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে থিসিউস্ যখন গোলকধাঁধার ভেতরে ঢুকল, তখন সে সুতো ছেড়ে ছেড়ে ঠিক রাখল পথের দিশা। কিছুদূর যেয়ে সে অনিবার্যভাবে সামনে পড়ে গেল রাক্ষস মাইনোটরের। কিন্তু অস্ত্রের সাহায্যে সহজেই সে বধ করল মাইনোটরকে; আর রেখে যাওয়া সূত্র ধরে বেরিয়ে এল গোলকধাঁধা থেকে। এর পর রাজকন্যে এরিয়াড্‌নিকে সঙ্গে নিয়ে থিসিউস্ পাড়ি জমাল নিজ দেশের উদ্দেশে।

ডিডেলাসের এই আচরণের কথা ক্রমে পৌঁছল রাজা মাইনসের কানে। ডিডেলা-সের ওপর তিনি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বিশ্বাসঘাতক ঠাউরে তাঁকে আটক করলেন এক দুর্গে। কৌশলী ডিডেলাস্ দুর্গ থেকে পালালেন। দুর্গ থেকে বের হলেন বটে, কিন্তু দ্বীপ থেকে পালাতে না পারেন, এজন্য রাখা হল কড়া পাহারা। মাইনস্ জল ও ডাঙ্গা দুইই আগলান—কিন্তু আকাশ? ঐ শূন্য পথেই আমি পালাব—মনে মনে এই অসম্ভব ফন্দি ঠাওরালেন উদ্ভাবক-শ্রেষ্ঠ ডিডেলাস্!

তাঁর গোলকধাঁধার বুদ্ধি ছিল আটক করার। এবার আকাশে ওড়ার বুদ্ধি হবে বাঁধন কাটার—বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি। এজন্য ডিডেলাস্ ব্যবহার করলেন তার সকল কলাকৌশল।

ছেলে আইকেরাস্‌কে সঙ্গে নিয়ে কয়েক দিন ধরে তিনি লুকিয়ে সংগ্রহ করলেন সামুদ্রিক পাখীর শক্ত, লম্বা পালক। যখন বেশ কিছু পালক জমল, তখন সেগুলি পাশা-পাশি সাজিয়ে তিনি একত্র করলেন, আর নিপুণ হাতে মোম দিয়ে জুড়ে দিলেন এক

সঙ্গে। এভাবে তৈরি হল দু'জোড়া চওড়া পাখা। বাপ ও ছেলে নিজেদের বাহুর সঙ্গে মজবুত করে পাখাগুলো বেঁধে নিলেন আর গোপনে চলতে লাগল তাঁদের ওড়বার মহড়া।

সব কিছু ঠিকঠাক হ'লে একদিন সবার অলক্ষ্যে আকাশে উড়লেন ডিডেলাস্ ও আইকেরাস্। মাঠ, নদী, পাহাড়ের ওপর দিয়ে তাঁদের যাত্রা শুরু হল। সমুদ্রের হাওয়া ডানায় লাগতেই তাঁদের গতি গেল বেড়ে। নীচে মাঠে ঘাটে মানুষ কাজ থামিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে; ভাবল, দেবতাদের দু'জন বুঝি উড়ে যাচ্ছে! চলতে চলতে তাঁরা বামে ডেলস্ ও ডাইনে লেবিন্থস্ অতিক্রম করলেন।

বেশ কিছু দূর একত্রে শূন্য পথে উড়ে গেলেন ডিডেলাস্ ও আইকেরাস্। কিন্তু তারপর ঘটল এক অঘটন। ওড়ার আগে ডিডেলাস ছেলেকে পইপই করে বারণ করে দিয়েছিলেন, কখনও খুব উঁচু অথবা খুব নীচু দিয়ে ওড়বার চেষ্টা সে যেন না করে। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু খোলা আকাশে পাখা মেলার আনন্দে দুঃসাহসী ছেলে আইকেরাস ভুলে গেল সে সাবধানবাণী। উড়তে উড়তে এক সময় সে এত ওপরে উঠে গেল যে, সূর্যের তাপে তার পাখার মোম গলতে শুরু করল। খেয়াল করার আগেই পালকগুলি আলগা হয়ে গেল, আর ঝরে পড়তে লাগল একটি একটি করে। অবলম্বন হারিয়ে আইকেরাস্ পড়ে গেল সমুদ্রের অথৈ পানিতে। এভাবে ঘটল আকাশ পথে প্রথম দুর্ঘটনা, আর সাহসী কিশোর আইকেরাসের শোচনীয় সলিল-সমাধি!

বাকী পথ একা একা অতিক্রম করে ডিডেলাস্ পৌঁছলেন সিসিলি-দ্বীপে। অভিনব এই আগন্তুককে গ্রহণ করতে সেখানে মহা ধুমধাম পড়ে গেল। উপযুক্ত মর্যাদায় সিসিলি-রাজ অভ্যর্থনা জানালেন প্রথম আকাশচারীকে, আর তাঁকে উচ্চ আসন দিলেন তাঁর রাজসভায়। এখানে নতুন করে শুরু হল ডিডেলাসের কারিগরী ও আবিষ্কারের কাজ।

মাইনস্ কিন্তু পলাতক আসামীকে ভুলে যাননি। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে একদিন তিনি এসে উপস্থিত হলেন সিসিলি-দ্বীপে। ডিডেলাস সেখানে আছে জেনে রাজাকে গিয়ে তিনি অনুরোধ জানালেন তাঁর পুরনো সভাসদকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু তাঁর মতলব বুঝতে সিসিলি-রাজের মোটেই বেগ পেতে হল না। তাই তিনি তাঁর অনুরোধ তো রাখলেনই না, বরং একদিন কৌশলে তাঁকে হত্যা করলেন পানিতে ডুবিয়ে।

সিসিলি-রাজ বুঝতে পেরেছিলেন আবিষ্কার আর উদ্ভাবনার আদিগুরু ডিডেলাসের মূল্য!

আরাক্‌নির দম্ভ

আরাক্‌নি নামে ছিল এক মেয়ে। যেমন সে গুণী, তেমনি অংহকারী। কাপড়-বোনা আর সুচের কাজে তার এমন দক্ষতা যে বন পাহাড় থেকে অপ্সরীরা এসে মুগ্ধ হয়ে তার কাজ দেখত। ভেড়ার লোম ঝাড়াই বাছাই করে নিপুণ হাতে পাক দিয়ে মিহি রেশমের মত বিছিয়ে দিত তাঁতে, আর তা থেকে বেরিয়ে আসত সুন্দর মসৃণ কাপড়। এ কাপড়ের ওপর তার সূচীকর্ম ছিল আরো অপূর্ব! কে বলবে সূচীকর্মের দেবী মিনার্ভার নিজের হাতের কাজ নয়। কেউ কেউ এমন কথা কখনও কখনও বলেও ফেলত। আরাকনি কিন্তু যেত আরো এক ধাপ বেশী। সে মনে করত, দেবী বলেই মিনার্ভার এত নাম। আসলে গুণের বিচারে তার ওপরে কেউ নেই। সুযোগ যদি কোনদিন আসে, সে প্রমাণ করে দেবে, মিনার্ভার চাইতে তার দক্ষতাই বেশী। দেমাগী মেয়ে এ নিয়ে কখনও কখনও প্রকাশ্যে বড়াই করতেও পিছ পা হ'ত না।

এমন দম্ভের কথা ক্রমে মিনার্ভা দেবীর কানে গিয়ে পেঁছিল। তিনি মনে মনে ভারী অসন্তুষ্ট হলেন আরাকনির ওপর। তবু একদিন এক বুড়ির ছদ্মবেশে তার কাছে গিয়ে সহজ ভাবে বললেন, 'বাছা, নিজের গুণপনা নিয়ে কখনো এত অহংকার করতে নেই। এতে পাপ হয়, আর দেবতারা অখুশী হন। নিজের তুলনা যদি করবেই, তবে আর দশটি মেয়ের সঙ্গে কর, দেবদেবীদের সঙ্গে নয়। বরং বড়াই করে তুমি যেটুকু দোষ করেছ, তার জন্য ক্ষমা চাও। মিনার্ভাদেবী নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবেন।'

আরাকনি বুড়ির কথাকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিল, আর আগের মতই গলা চড়িয়ে জাহির করতে লাগল নিজের গুণপনার কথা। সগর্বে সে ঘোষণা করতে ছাড়ল না, সূচীকর্মে তার ওপরে আর কেউ নেই!

'তাহলে তুমি দেখো' বলে মিনার্ভা তখনই দেখা দিলেন তাঁর আসল চেহারায়। দেবরাজ জুপিটারেরর কন্যা জ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার দেবী তাঁর শিরস্ত্রাণ পরিহিত আপন মূর্তিতে আবির্ভূত হতেই আলোর বন্যায় ভরে গেল আরাকনির সামান্য কুটির। একগুঁয়ে মেয়ে আরাকনি তবুও অবিচল। বুদ্ধিহীনার মত সে ভাবল, এবারই তার সুযোগ। এত কালের প্রতীক্ষার পর আজকে সে দেখিয়ে দেবে দুজনের মধ্যে কার কাজ বেশী সূক্ষ্ম!

তখনই শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা। দু'জনেই তাঁতে চড়িয়ে দিল সুতো। চিকন মাকুগুলো বিদ্যুতের মত এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। রামধনুর মত ফুটে উঠতে লাগল রংয়ের পর রং, আর স্বপ্নের মত ছবির পর ছবি।

মিনার্ভা আঁকলেন এক সময়ে সমুদ্রদেব নেপচুনের সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতার গৌরবময় দৃশ্য। তাতে দেখানো হল, দেবরাজ জুপিটার সহ বারো জন প্রধান দেব-দেবীকে। ছবিতে নেপচুন তাঁর মাছ মারার অস্ত্র দিয়ে মাটিতে আঘাত করতেই তা থেকে



বেরিয়ে আসছে একটি ঘোড়া। মিনার্ভা নিজেকে আঁকলেন তাঁর সুবিখ্যাত ঢাল ও শির-স্ত্রাণ সজ্জিত বিজয়িনীর বেশে; হাতে তাঁর নিজের সৃষ্ট সবুজ জলপাই চারা। দেবতাদের বিচারে নেপ্‌চুনের ঘোড়ার চাইতে মিনার্ভার জলপাই চারা অধিকতর মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিল। এ ছবির আশেপাশে আঁকা হল আরো নানা দৃশ্য। তাতে কোথাও কোথাও দেখানো হল অতিরিক্ত অহংকার করে আর দেবতাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যেয়ে মানুষ কেমন করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

আরাকনিও কম গেল না। সূক্ষ্ম তন্তুর ওপর নির্ভুলভাবে সে ফুটিয়ে তুলতে লাগল নানা দৃশ্য। সে-ও দেখাতে লাগল দেবদেবী ও মানুষের নানা কাহিনী। আর এগুলির মধ্যে সে দেখাতে ছাড়ল না দেবদেবীদের দোষ ত্রুটির কথা। আঁকতে আঁকতে সে ফুটিয়ে তুলল স্বয়ং দেবরাজ জুপিটারের নানা স্খলন-পতনের কাহিনী।

মিনার্ভা আর সহ্য করতে পারলেন না। হাতের মাকুটি ছুঁড়ে মেরে তিনি আরাকনির সুদৃশ্য কাপড়টি ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললেন। তারপর আঙুল দিয়ে তার কপাল স্পর্শ করতেই অতীত আচরণ আরাকনির কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল, আর অনুতাপে সমস্ত

মন গেল ভরে। লজ্জায় দুঃখে সে তখন ছুটল আত্মহত্যা করতে। কিন্তু ঘরের কোনে একটি দড়িতে ঝুলতে যেতেই মিনার্ভা বারণ করলেন, 'না, না, মরতে তোমাকে হবে না। তুমি বেঁচে থাক; কিন্তু এমন ভাবে বেঁচে থাক যে চিরকাল সবার জন্য তুমি হয়ে থাকবে উপযুক্ত একটি শিক্ষা!'

এই বলে তিনি তার ওপর এক ফোঁটা পানি ছিটিয়ে দিতেই নিমেষে আরাকনির হাত পা নাক মুখ পরিবর্তিত হয়ে যেতে লাগল। সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গিয়ে শীঘ্রি সে পরিণত হল কালো, কুৎসিত একটি কীটে! অবাক হয়ে সবাই লক্ষ্য করল, সুতোর সঙ্গে ঘরের কোণে ঝুলে রয়েছে কদাকার কুশ্রী একটি মাকড়সা!

কাপড়-বোনা ও সেলাইয়ের বাড়তি অহংকার নিয়ে আরাকনি ও তার বংশধরেরা আজ পর্যন্ত ঘরের অন্ধকার কোণে, আড়ালে আবডালে এক মনে বুনে চলেছে তাদের সূক্ষ্ম, কারুকার্যময়, সুদৃশ্য, ক্ষণস্থায়ী জাল!

মাটির কন্যা প্রসারপিনা



পৃথিবীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, কেমন ফুল-ফসল শস্য-শ্যামলিমায় ঘেরা অপরূপা সে। প্রাচীনকালের গ্রীকদের কাছে সে একটি মরা মাটির খণ্ড মাত্র নয়। সে যেন এক দেবী,—নাম তাঁর সিরিস্। তাঁর আশীর্বাদে বীজ থেকে গাছ হয়, ফুল থেকে ফল ধরে, মাঠে মাঠে ফসল ফলে। পৃথিবী-মাতা তিনি; তিনি আমাদের মুখে অন্ন জোগান।

দেবী সিরিসের আদুরে মেয়ে প্রসারপিনা। ডাগর, লতিয়ে-ওঠা তার দেহ, আর শ্যামল, স্নিগ্ধ তার রূপ। সদ্য ফোটা ফুলটির মত এই মেয়েটি একদিন সঙ্গিনীদের নিয়ে এশিয়ার নিসীয় প্রান্তরে ফুল কুড়াচ্ছিল। হঠাৎ সামনে দেখতে পেল অপরূপ এক নার্-সিসাস্। খুশীতে ডগমগ হয়ে যেই সে তার বোঁটাটি ধরতে হাত বাড়িয়েছে, অমনি সামনের মাটি দু'ভাগ হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন পাতালপুরীর রাজা প্লুটো, আর নিমেষে তাকে তাঁর রথে তুলে নিয়ে অদৃশ্য।

মা সিরিস্ দূর থেকে প্রসারপিনার চীৎকার শুনতে পেলেন, কিন্তু এসে দেখতে পেলেন না কিছুই। শত চেষ্টাতেও কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ভোরের শুকতারা আর দিনশেষের সন্ধ্যাতারা দেখল আলুথালু মা তার মেয়েকে কেবল খুঁজছেনই।

ন'দিন ন'রাত্রি তিনি খুঁজে বেড়ালেন চার দিকে। শেষে তিনি জানতে পারলেন, প্রসারপিনাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাতালপুরীতে, সে এখন যমরাজ প্লুটোর রানী!

ক্ষোভে, দুঃখে সিরিস্ দেবতাদের বাসস্থান অলিম্পাসের চূড়া ছেড়ে দিয়ে নেমে এলেন সাধারণ মানুষের বসতিতে। কিন্তু সেখানেও তিনি স্বস্তি পেলেন না। ঘুরে বেড়ালেন দিগ্বিদিক পাগলিনীর মত। তাঁর অমনোযোগে খরা বৃষ্টিতে মাঠঘাট নষ্ট হল, খেত-খামার হালগরু শেষ হল, ফসল শুকিয়ে গেল। আগাছা, কাঁটাঝোপে ছেয়ে গেল পৃথিবী।

অবস্থা দেখে দেবরাজ জুপিটার বিপদ গণলেন। এভাবে পৃথিবী তো আর চলতে পারে না। তাই তিনি দেবদূত মার্কারিকে পাঠালেন পাতালপুরীতে। তাঁর ভাই প্লুটোকে অনুরোধ করে পাঠালেন, প্রসারপিনাকে অবশ্যই যেন ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয় পৃথিবীতে।

দেবরাজের নির্দেশ: প্লুটো তা অমান্য করেন কি করে? কিন্তু প্রসারপিনাকে ছাড়তেও তাঁর মন চায় না। তাই তিনি আশ্রয় নিলেন এক কৌশলের। পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠাবার আগে তাকে তিনি খাইয়ে দিলেন পাতালপুরীর বাগানে ফলা ডালিমের কয়েকটি দানা। এর ফলে পাতালপুরীর সঙ্গে প্রসারপিনার গাঁটছড়া হল পাকাপাকি। প্রসারপিনা পৃথিবী-মাতার কন্যা, কিন্তু পাতালপুরীরও রানী—একথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। শেষে এ-উভয় সংকটের সমাধান করে দিলেন দেবরাজ জুপিটার: বছরের ছ'মাস প্রসারপিনা থাকবে পৃথিবীতে, স্নেহময়ী মায়ের কাছে, তাঁর আদরের দুলালী হয়ে। আর বাকী ছ'মাস সে থাকবে পাতালে, প্লুটোর সঙ্গে, তাঁর আঁধারপুরী আলো করে!

বছরের যে অর্ধেক প্রসারপিনা মায়ের সঙ্গে থাকে, তখন পৃথিবীতে বসন্ত ও গ্রীষ্ম-কাল—আবহাওয়া উষ্ণ, চারদিকে আলোর মেলা, ফুল-ফল শস্য-শ্যামলিমায় পৃথিবী হাসতে থাকে। আর যখন প্রসারপিনা স্বামীর সঙ্গে পাতালপুরীতে, তখন পৃথিবীতে হেমন্ত ও শীত ঋতু—পৃথিবী হিম-শীতল, ছায়ায় ঢাকা, গাছপালা পাতা ঝরা, মাঠঘাট খাঁ খাঁ।

প্রতি বছর শীত-গ্রীষ্মের পালাবদলে তোমরা পৃথিবীর আদুরী মেয়ের স্বামীর কাছে ও মায়ের বাড়িতে আসা-যাওয়ার এই চিরন্তন পর্বটিই দেখতে পাও।

শিল্পীর সাধনা

পিগ্‌ম্যালিয়ন নামে ছিলেন একজন শিল্পী। পাথরে খোদাই করে মূর্তি গড়াই ছিল তাঁর কাজ। জীবনে আর কোন কিছুতে তাঁর কোন খেয়াল ছিল না। পাথরের ঠাণ্ডা জগতে তাঁর দিনরাত্রি আনাগোনা। কঠিন পাথরের ওপর ছেনি চালিয়ে তিনি গড়ে তোলেন সুন্দর সুন্দর মূর্তি।

একবার শ্বেত পাথরে পিগম্যালিয়ন গড়ে তুললেন অপূর্ব এক নারী মূর্তি। অনবদ্য তার সৌন্দর্য। আর গড়নে, হাবভাবে, চাহনিতে, এমন জীবন্ত যে মনে হয়, কেবলমাত্র স্বাভাবিক সংকোচে সে পা ফেলে এগিয়ে আসছে না। একবার তার দিকে তাকালে আর চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। নিজের সৃষ্টিতে পিগম্যালিয়ন নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।



ক্রমে মূর্তিটির সঙ্গে পিগম্যালিয়নের গড়ে উঠল এক নিবিড় সম্পর্ক। পিগম্যালিয়ন সারাক্ষণ তার কাছে কাছেই থাকেন। মূর্তিটিকে রেখে তিনি একদণ্ডও কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন না। কোন কাজে বাইরে গেলে এক অদৃশ্য টান তাঁকে ঘরের দিকে টানতে থাকে। তিনি আবার ফিরে আসেন মূর্তিটির কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন নিজের সৃষ্টিকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছেন।

কিন্তু মূর্তি তো মূর্তিই, একখণ্ড পাথর মাত্র। যতই তা জীবন্ত দেখাক, আসলে তো প্রাণহীন, নিশ্চল, জড়। পিগম্যালিয়নের সমস্ত আবেগ তার শীতল শরীরে লেগে ঠিকরে আসে।

ক্রমে এ অবস্থা পিগম্যালিয়নের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। মূর্তিটিকে তিনি কেমন করে পাবেন সত্যিকার মানুষরূপে, এ চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। অনেক ভেবে তিনি ঠিক করলেন, তিনি যাবেন ভালোবাসার দেবী ভিনাসের কাছে। তাঁর সাহায্য তিনি চাইবেন তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে।

ভিনাসদেবীর উৎসবের দিনে তাই প্রার্থনায় বসলেন পিগম্যালিয়ন। এক মনে তিনি ডাকলেন দেবীকে। তাঁর নিষ্ঠায় দেবী মুগ্ধ হলেন। পিগম্যালিয়ন তাঁর কাছে বর চাইলেন, তাঁর তৈরী মূর্তি যেন প্রাণ পায়। ভিনাস খুশী হয়ে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

দিনের শেষে পিগম্যালিয়ন ফিরে এলেন তাঁর ঘরে। অন্য দিনের মত আজকেও তিনি প্রথমেই গেলেন মূর্তিটির কাছে; আর তাকে স্পর্শ করলেন তাঁর হাত দিয়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে এখন আর নিষ্প্রাণ, শীতল পাথর খণ্ড মাত্র নয়; সে এক পরিপূর্ণ, জীবন্ত মানুষ—অনুভূতিশীল, উষ্ণ, কোমল।

সাধনায় শিল্পী সত্যই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর শিল্পকর্মে!

বেলেরোফনের ভাগ্য-বিপর্যয়

গ্রীক রূপকথায় নানা কাল্পনিক জীবজন্তুর বিবরণ পাওয়া যায়ঃ যেমন, 'সেণ্টর' (অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক ঘোড়া), 'স্ফিংক্স' (সিংহের শরীর ও নারীর মুখ) ও 'স্যাটার' (ছাগল ও মানুষের মিলিত রূপ)। কিন্তু এদের মধ্যে যেমন কিম্ভূতকিমাকার, তেমনি ভয়ঙ্কর হচ্ছে 'কিমেরা'। এর সম্মুখ ভাগ সিংহের, মাঝের অংশ ছাগলের, আর পেছনের দিকটি ড্রাগনের। হিংস্রতায় সে সব জন্তুকে হার মানায়। একবার লিসিয়া রাজ্যে এর তাণ্ডবলীলা শুরু হল; আর শেষ হয়ে যেতে লাগল যত জীবজন্তু, মাঠঘাট, লোকালয়।

কিমেরার ধ্বংসলীলা যখন চরমে উঠেছে, তখন এদেশের রাজা আয়োবেটিসের রাজসভায় এসে উপস্থিত হল এক সুদর্শন যুবক, নাম তার বেলেরোফন। সে এসেছে রাজার জামাতার কাছে থেকে এক পরিচয়পত্র নিয়ে। কিন্তু আজব সে পরিচয়পত্রঃ এতে প্রথম প্রথম বেলেরোফনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা; কিন্তু শেষে ছোট্ট একটি অনুরোধ, রাজা যেন তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে ফেলেন। আসল কথা কি, রাজার জামাতা ছিল বেলেরোফনের



রূপে গুণে ঈর্ষাকাতর। তাই তার গুণের কথা স্বীকার করলেও এ-ভাবে ফাঁদ পেতেছে তাকে খতম করার।

এমন একজন সুলক্ষণ, সুন্দর যুবককে হত্যা করতে গিয়ে রাজা কিন্তু দ্বিধায় পড়লেন। অনেক ভেবে চিন্তে তাই ঠিক করলেন, বেলেরোফনকে তিনি পাঠাবেন কিমেরাকে বধ করতে। অনুরোধ করলেন, বেলেরোফন যেন কিমেরাকে বধ করে তাঁর অসহায় দেশবাসীকে রক্ষা করে। এ দুঃসাহসিক অভিযানে তার যদি মৃত্যু হয়, তবে তাই হোক, এই ছিল আয়োবেটিসের গোপন ইচ্ছে। কিন্তু শক্তিমান, উৎসাহী যুবক বেলেরোফন সহজেই এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

তবে বেলেরোফন বুঝতে পারল এই ভয়ঙ্কর জীবের সঙ্গে লড়াই করা সহজ কথা নয়। তাই আটঘাট বেঁধেই সে যাত্রা শুরু করল। প্রথমেই সে গেল এক দৈবজ্ঞের পরামর্শ নিতে। দৈবজ্ঞ জানাল, দেবী মিনার্ভার আশীর্বাদ নিয়ে, পেগেসাস্ ঘোড়ায় চড়ে তবে তাকে লড়াইয়ে যেতে হবে। পেগেসাস্ এক পক্ষীরাজ ঘোড়া। এক কালে মহাবীর পার্‌সিউস্ যখন তাঁর তলোয়ারের আঘাতে ভয়ঙ্করী দানবী মেডিউসার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, তখন তার ফিন্‌কি দেওয়া রক্ত থেকে জন্মলাভ করে এই পক্ষীরাজ ঘোড়া। মিনার্ভা এই তাজিকে পোষ মানিয়ে কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজ্‌দেরকে উপহার দিয়েছিলেন। মিউজ-দের আবাসস্থল হেলিকন্ পাহাড়ে এর এক খুরের আঘাতে প্রবাহিত হয়েছিল হিপক্রিন্ ঝরণা। হিপক্রিনের ধারাকে তাই কাব্য প্রেরণার উৎস বলে মনে করা হয়।

বেলেরোফনের মিনতি শুনে মিনার্ভাদেবী তাকে দিয়ে দিলেন একটি সোনার বল্গা। বল্গা হাতে বেলেরোফন গেল পেগেসাসের কাছে। পেগেসাস্ তখন পিরেনির জলাশয়ে পানি খাচ্ছিল। সোনার বল্গা দেখে সে স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিল। পক্ষীরাজে চড়ে আকাশপথ পাড়ি দিয়ে বেলেরোফন এসে উপস্থিত হল কিমেরার কাছে। সেখানে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে কিমেরাকে হারিয়ে দিয়ে তাকে বধ করল বেলেরোফন।

প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আয়োবেটিস্ বেলেরোফনের জন্য নির্ধারণ করলেন আরো কয়েকটি অগ্নি-পরীক্ষা। কিন্তু পেগেসাসের সহায়তায় প্রতিবারই সে উত্তীর্ণ হল সগৌরবে। অবশেষে রাজা খুশী হয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন তাঁর আর এক কন্যার। যৌতুকস্বরূপ বেলেরোফোনকে দান করলেন তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকার।

বেলেরোফনের শেষ পরিণতি কিন্তু বড় দুঃখজনক। সাফল্যের গরিমায় বেলেরোফন ক্রমে হয়ে উঠল অতিরিক্ত অহংকারী। তার সীমাহীন দাম্ভিকতার ফলস্বরূপ শেষ জীবনে সে হল অন্ধ ও খঞ্জ।

মানুষের সমাজ এড়িয়ে মরুপ্রান্তরে ঘুরে ঘুরে দুঃখদুর্দশায় মৃত্যুবরণ করল সৌভাগ্যের বরপুত্র বেলেরোফন!

হিরো ও লিয়ান্ডার

এশিয়া মহাদেশ আর ইয়োরোপ। মাঝখানে এক সরু জলরেখা—এর নাম বস্‌ফরাস। সেকালে বস্‌ফরাসের পুবের তীরে ছিল এবিটস্ শহর, আর পশ্চিমে সেস্‌টস্। এক সময় এবিটসের তরুণ যুবক লিয়ানডারের সঙ্গে পরিচয় হল সেস্‌টসের ভিনাস দেবীর মন্দিরের সেবিকা সুন্দরী হিরোর। ক্রমে এ পরিচয় পরিণত হল গভীর ভালোবাসায়।

হিরো ও লিয়ানডার পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু তাদের মাঝখান দিয়ে বয় উত্তাল, ঢেউ-ভাঙা বস্‌ফরাস্। এ বাধা তাদের অতিক্রম করতেই হবে। তাই প্রতি রাত্রিতে এবিটস্ থেকে প্রণালীর পানি সাঁতরে পার হয়ে লিয়ানডার উপস্থিত হত হিরোর কাছে। প্রতি সন্ধ্যায় হিরো মন্দিরের তোরণে জ্বালিয়ে রাখত একটি প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় বস্‌ফরাসের কালো পানিতে দিক ঠিক করত লিয়ান্‌ডার।



এমনি করে কেটে গেল বেশ কিছু দিন। কিন্তু এরপর ঘটল এক অঘটন। এক সন্ধ্যায় দারুণ এক তুফান উঠল দিগ্‌বিদিক ছাপিয়ে। প্রণালীর পানি উত্তাল পাথাল হয়ে উঠল, আর বাতাসে মন্দিরের প্রদীপটি গেল নিভে। অন্ধকারে, ঝড়-বাদলে লিয়ান্‌ডার দিক হারিয়ে ফেলল। মাঝপ্রণালীতে ঢেউয়ের আবর্তে সে গেল তলিয়ে, আর এভাবেই ঘটল তার করুণ সলিল-সমাধি।

রাত্রিশেষে আলো ফুটতে সেস্‌টসের উপকূলে ভেসে থাকতে দেখা গেল লিয়ান্‌ডারের মৃতদেহ। দেখেই হিরো বুঝতে পারল ঝড়ের রাতের নিদারুণ দুর্ঘটনার কথা। অসহনীয় দুঃখে বস্‌ফবাসের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন দিল সে-ও।

বস্‌ফরাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিশে থাকল হিরো ও লিয়ান্‌ডারের ভালোবাসার আর্তি।

পিরামুস ও থিস্‌বি

সম্রাট সেমিরামিসের সময়ে ব্যাবিলন শহরের সবচাইতে সুদর্শন যুবক ছিল পিরামুস আর সবচাইতে সুন্দরী মেয়ে থিস্‌বি। তারা ছিল প্রতিবেশী, আর ছোট বেলা থেকেই ভালোবাসত একে অপরকে। কিন্তু তাদের দুই পরিবারের মধ্যে ছিল চিরকালের শত্রুতা। ঝগড়া বিবাদ ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। তাই পিরামুস ও থিস্‌বির পক্ষে প্রকাশ্যে কোথাও মিলিত হওয়া সম্ভব ছিল না। দু'বাড়ির মাঝখানের দেয়ালে ছিল একটি ফাটল। সুযোগ পেলে এই ফাটলপথেই তারা বিনিময় করত তাদের সুখদুঃখের কথা।



এমনিভাবেই কেটে গেল অনেক দিন। কিন্তু যতই সময় যায়, তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল মাঝখানের এই কঠিন দেয়াল। এ বাধা তাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে। অনেক ভেবে তারা ঠিক করল, বাড়ি থেকে দু'জনে পালিয়ে যাবে দূরে; অনেক দূরে, যেখানে নেই তাদের দুই পরিবারের চিরন্তন কলহ! ঠিক হল, এক জ্যোৎস্না রাতে তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে, আর মিলিত হবে শহরের বাইরে বনের মাঝে ঝর্ণার ধারে একটি গাছের নীচে।

নির্দিষ্ট রাতে ঠিক সময় মত থিস্‌বি গাছটির কাছে যেয়ে পৌঁছল। কিন্তু অদূরেই সে দেখতে পেল এক ভীষণাকার সিংহ। সে শিকার গ্রাস করে পানি খেতে এসেছে ঝর্ণা থেকে। প্রাণভয়ে দৌড়ে থিস্‌বি আশ্রয় নিল এক গুহায়। কিন্তু পথে তার ওড়না লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। হিংস্র সিংহ রক্তাক্ত মুখে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রেখে গেল সেই ওড়নাটি।

একটু পরেই পিরামুস সেখানে এসে উপস্থিত হল। চারদিকে তাকিয়ে কোথাও সে থিস্‌বির কোন সন্ধান পেল না। কিন্তু চোখে পড়ল মাটিতে সিংহের পায়ের দাগ, আর রক্তের ছোপ-লাগা ওড়নার টুকরোগুলো! থিস্‌বিকে নিশ্চিত সিংহে খেয়েছে মনে করে গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ল পিরামুস। এতকাল প্রতীক্ষার পর আর ধৈর্য ধারণ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সে বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করল সেখানেই।

পরক্ষণেই নিরাপদ ভেবে থিস্‌বি গুহা থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু সামনেই দেখতে পেল এই মর্মান্তিক দৃশ্য। নিদারুণ দুঃখে ও হতাশায় সে-ও নিজের বুকে বসিয়ে দিল পিরামুসের হাতের সেই ছুরি।

মৃত্যুর পর পিরামুস ও থিস্‌বিকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হল বনের মাঝে ঝর্ণার ধারে ছায়া-সুনিবিড় সেই গাছটির নীচে।

আটালান্টার দৌড়

আটালান্টা নামে মেয়েটির জীবনে ছিল ভাগ্যের লিখন ঃ বিয়েই হবে তার কাল। একথা জানতে পেরে তার বাবা-মা জন্মের পরই তাকে পাঠিয়ে দিলেন সমাজের বাইরে নির্জন এক যায়গায়,—বিয়ে যেন সে এড়াতে পারে। সেখানে একা একা আটালান্টা থাকল দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা, শিকার নিয়ে মশগুল হয়ে। দিনে দিনে সে বেড়ে উঠতে লাগল অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে হয়ে; কিন্তু দেহে তার পুরুষের সুঠামতা ও শক্তি। নানা খেলাধুলায় পুরুষদেরকে সে ছাড়িয়ে যায় অনায়াসে। কিন্তু তার সবচাইতে বড় দক্ষতা দৌড়ে। ক্ষিপ্রতায় বনের হরিণীকেও সে যেন হার মানায়!

সমাজকে আটালান্টা বরাবরই এড়িয়ে চলত। কিন্তু তাতেও রেহাই ছিল না। তার তীব্র চোখ-ধাঁধানো রূপে আকৃষ্ট হল অনেক গ্রীক যুবক। তারা তার কাছে প্রস্তাব পাঠাতে লাগল বিয়ের। ঝামেলা এড়াতে আটালান্টা তাদের জন্য আরোপ করল এক অদ্ভুত শর্ত: যে তাকে দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারবে, সেই হবে তার স্বামী। কিন্তু দৌড়-প্রতিযোগিতায় কেউ যদি তার কাছে হেরে যায়, তবে তাকে বরণ করে নিতে হবে মৃত্যু!

এই কঠিন শর্তেই কয়েকজন যুবক তার সঙ্গে দৌড়ে রাজি হল; আর জীবন দিল অনিবার্যভাবে। কিন্তু তাতেও সবাই নিবৃত্ত হল না। অবশেষে এই দৌড়-প্রতিযোগিতার যিনি বিচারক, সেই হিপোমিনিস্‌ই বাঁধা পড়ে গেল আটালান্টার রূপে। প্রস্তাব পাঠাল, সে দৌড়াবে আটালান্টার সঙ্গে।

কিন্তু দৌড়ের আগে হিপোমিনিস্ পড়ল বিষম চিন্তায়। সরাসরি দৌড়াতে গেলে তার পরাজয় ও মৃত্যু অবধারিত। তাই সে শরণাপন্ন হল ভালোবাসার দেবী ভিনাসের, প্রার্থনা করল তার অনুগ্রহ। ভিনাস্ তার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাকে একটি বুদ্ধি বাতলে দিলেন, আর হাতে দিয়ে দিলেন সাইপ্রাস্ দ্বীপে তাঁর মন্দিরের বাগান থেকে সংগ্রহ করে আনা তিনটি উজ্জ্বল সোনার আপেল!

নির্দিষ্ট দিনে দৌড় শুরু হল। বেশিক্ষণ না যেতেই তাতে ঘটতে গেল যা ঘটবার তাই। আটালান্টা যখন নিশ্চিতভাবে হিপোমিনিস্‌কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তখন সে তার সমুখে ফেলে দিল সঙ্গে লুকিয়ে রাখা একটি সোনার আপেল। সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে যেন একটি হলুদ আগুনের শিখা খেলে গেল! এর ঠিকরানো আলোতে সবারই চোখ গেল ধাঁধিয়ে। এমন একটি মহা-মূল্যবান বস্তুকে কুড়িয়ে নেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারল না আটালান্টা। তাই সে নত হয়ে হাত দিয়ে তুলে নিল সেই আপেলটি; আর তাতেই সে খানিকটা পিছিয়ে পড়ল দৌড়ে।



কিন্তু সে নিমেষের জন্যে। আপেলটি হাতে নিয়েই আটালান্টা তীর বেগে এগিয়ে গেল সমুখে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সে পিছে ফেলে চলল তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। ঠিক সময় বুঝে হিপোমিনিস্ ফেলে দিল তার দ্বিতীয় আপেলটি। এবারও আটালান্টা সেটি কুড়িয়ে নিতে হাত বাড়ালো। আগের মতই সে একটু পিছে পড়ে গেল; কিন্তু তা পূরণ করে নিতেও তার খুব বেশি বেগ পেতে হল না।

দৌড়ের শেষ ধাপে পৌঁছে আটালান্টা যখন চূড়ান্তভাবে ছাড়িয়ে যাচ্ছে হিপোমিনিস্‌কে তখন সে ছুঁড়ে দিল হাতের শেষ আপেলটি। সম্মুখে গড়িয়ে যাওয়া আলো-ঠিকরানো আপেলটি দেখে আটালান্টা দ্বিধায় পড়ল, এটিও সে তুলে নিতে যাবে কিনা। কিন্তু দেবী ভিনাসের প্রভাবে তার লোভ হল অপ্রতিরোধ্য। এবারও সে আপেলটি কুড়িয়ে নিয়ে সমুখে ছুটল। কিন্তু তখন আর সময় নেই। প্রাণপণ দৌড়েও আটালান্টা শেষরক্ষা করতে পারল না। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে হিপোমিনিস্‌কে সে গ্রহণ করল তার স্বামীরূপে।

এ বিয়েতে আটালান্টা ও হিপোমিনিস্ দু'জনেই খুব সুখী হল। কিন্তু ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে? তাদের বিপদ ঘটল আরেক দিক থেকে। সুখের পরিপূর্ণতার মুহূর্তে তারা ভুলে গেল দেবী ভিনাসের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করতে। এতে দেবী তাদের ওপর দারুণ রুষ্ট হলেন। তিনি অভিশাপ দিয়ে হিপোমিনিস্ ও আটালান্টাকে রূপান্তরিত করে দিলেন অরণ্যের দু'টি হিংস্র জন্তুতে।

প্রেমিকদের রক্তপাতকারী ক্ষিপ্রগতি শিকারী মেয়ে আটালান্টা রূপান্তরিত হল এক নৃশংস সিংহীতে, আর তার পরাক্রমশালী, শক্তিমান স্বামী হিপোমিনিস্ এক ভয়াল সিংহে—অরণ্য জগতের মহিয়ান রাজা ও রানীতে।

সিইক্স ও আল্‌সিওনি

থেসালি দেশের রাজা সিইক্স ও রানী আলসিওনি—পরস্পরকে তাঁরা গভীরভাবে ভালো বাসেন। কিন্তু সিইক্সের মনে একটুও শান্তি নেই। দেবতার অভিশাপে তাঁর এক ভাই রূপান্তরিত হয়েছেন বাজপাখীতে। কি করে তাঁকে আবার মানুষরূপে ফিরে পাওয়া যায়, এই তাঁর মহা ভাবনা। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা তীর্থক্ষেত্রে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। শেষে তিনি স্থির করলেন, তিনি যাবেন আয়োনিয়া রাজ্যের ক্ল্যারস নামক স্থানে; সেখানে তিনি পরামর্শ নেবেন এপোলোদেবের এক দৈবজ্ঞের।

সব কিছু ঠিকঠাক হলে এল বিদায় নেবার পালা। দু'জনে আলাদা হবার ভয়ে আলসিওনি শোকাতুর হয়ে পড়লেন। অনেক কষ্টে তাঁকে সিইক্স বুঝিয়ে গেলেন, দু'মাসের মধ্যে অবশ্য তীর্থ শেষ করে তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁর হিসেবে রয়ে গেল মস্ত এক ভুল। সমুদ্র পথে বেশী দূর না যেতেই উঠল এক প্রচণ্ড ঝড়। বাতাসের মাতন বেড়েই চলল, আকাশ ভেঙে নামল ঢল। বিশাল ঢেউয়ের সঙ্গে সিইক্সের ছোট্ট জাহাজটি প্রাণপণ লড়াই করল অনেকক্ষণ। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। যাত্রীসহ এক সময়ে তা হারিয়ে গেল দিক-চিহ্নহীন অথৈ পানিতে।

দিনের পর দিন যায়—স্বামীর ফেরার পথ চেয়ে থাকেন আলসিওনি। কিন্তু মাসের পর মাস বয়ে চলল, তবু তাঁর ফেরার নাম নেই। নানা আশংকায় ছেয়ে গেল আলসিওনির মন। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। শেষে মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি পেঁীছে তিনি দাম্পত্য-জীবনের দেবী জুনোর কাছে করুণ মিনতি করলেন, ভালো হোক, মন্দ হোক, তাঁর স্বামীর সঠিক খবর যেন তাঁকে এনে দেওয়া হয়।

তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল। দেবী জুনো আদেশ করলেন, একটি স্বপ্নের মারফৎ আলসিওনিকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় তাঁর স্বামীর প্রকৃত অবস্থা।

জুনোর অনুচরী রংধনু দেবী আইরিস্ যাত্রা করলেন স্বপ্নদেব মর্‌ফিউসের দেশে। গায়ে তাঁর সাত-রং উত্তরীয়টি জড়িয়ে নিয়ে, স্বর্গের সেতু বেয়ে তিনি নেমে গেলেন গোধূলির সীমারেখা পেরিয়ে মর্‌ফিউসের নিঝুম ঘুম-পুরীতে। সেখানে আবছায়া অন্ধকারে, ঝরণার অবিরাম শব্দে ঘুমে ঢুলুঢুলু মর্‌ফিউস্‌কে তিনি পেলেন তাঁর এবনি কাঠের পালঙ্কে পাখীর পালকের বিছানায়। অনেক কষ্টে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে তিনি তাঁকে জানালেন দেবী জুনোর নির্দেশ। চারদিকে ভেসে বেড়ানো ছায়া উপচ্ছায়া একত্র করে স্বপ্নটি তৈরী করে দিয়ে মর্‌ফিউস্ আবার ঘুমে এলিয়ে পড়লেন। আইরিস্ স্বপ্নটি বয়ে নিয়ে এলেন পৃথিবীতে।

ভোর বেলাকার স্বপ্নে আলসিওনি দেখতে পেলেন সমুদ্রে ঝড় ও জাহাজডুবির করুণ দৃশ্য, আর তাতে তাঁর স্বামীর মর্মান্তিক মৃত্যু। দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে তিনি ছুটলেন

সমুদ্রের দিকে। তীরে পৌঁছে তিনি সত্যিই দেখতে পেলেন ঢেউয়ের ওপর আন্দোলিত স্বামীর ভাসমান মৃতদেহ। আলসিওনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়ে প্রাণ দিলেন তিনিও।



সিইক্স ও আলসিওনির ভালোবাসায় দেবী জুনো মুগ্ধ হলেন। তাঁদের এই পরিণতি দেখে তাঁর মনে করুণা হল। তিনি তাঁদের রূপান্তরিত করে দিলেন দুটি সামুদ্রিক পাখীতে। এদের নাম 'আলসিওন' পাখী। সমুদ্রের ফেনার ওপর তারা বাসা বাঁধে, আর ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সারাটি দিন এক সঙ্গে উড়ে বেড়ায়। এরা ডিম থেকে যখন বাচ্চা ফুটায়, তখন কিছুকালের জন্য ঢেউ-ভাঙা সমুদ্রও হয় একেবারে শান্ত!

সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ এ দিন ক'টিকে বলা হয় 'আলসিওন দিন।'

মিলিয়েগার ও আটালাণ্টা

ক্যালিডন্ রাজ্যের রাজা ঈনিয়াস্ ও রানী এল্থিয়া। তাঁদের আদরের ছেলে মিলিয়েগার্। মিলিয়েগারের জন্মের সময় মা জানতে পারলেন, ভাগ্যদেবীরা তাঁর ছেলের জীবনকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠের সঙ্গে। কাঠটি পুড়ে পুড়ে যখন ছাই হয়ে যাবে, তখন তার আয়ুরও শেষ। ভয়ে তখনি কাঠটি পানিতে নিবিয়ে মা সযত্নে রেখে দিলেন ঘরের এক কোণে।

মিলিয়েগার ক্রমে বড় হয়ে উঠল। সে যখন যুবক, তখন এক উৎসবের দিনে রাজা ঈনিয়াস্ দেবদেবীদের পুজো দিতে গিয়ে ভুলে গেলেন কুমারী দেবী ডায়ানাকে।



ক্ষুব্ধ হয়ে ডায়ানা তাঁর রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন এক ভয়ঙ্কর বুনো শুয়োর। এর তাণ্ডবে সারা দেশ ছারখার হয়ে যেতে লাগল। মানুষজন, বাড়িঘর, খেতখামাড় সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে লাগল এই আসুরিক জন্তু।

নিরুপায় হয়ে ঈনিয়াস্ সাহায্য চাইলেন তাঁর যত বন্ধু দেশের। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নানা দেশ থেকে জমায়েত হল বীরেরা। ক্রমে সেখানে গড়ে উঠল এক বিরাট বাহিনী। সবাই একত্র হলে একদিন শুরু হল সেই শূকর-নিধন অভিযান।

আগন্তুক বীরদের মধ্যে একজন ছিল কিন্তু মেয়ে, নাম তার আটালান্টা। মেয়ে বটে, তবে শরীরে পুরুষের শক্তি; খেলাধুলা, যুদ্ধবিদ্যায় কারো চাইতে কম যায় না। যেমন সুঠাম তার দেহ, তেমনি তীব্র তার রূপ। মিলিয়েগার দেখেই তাকে ভালোবেসে ফেলল।

পশু-শিকার চলল বহুক্ষণ ধরে। একে একে সব বীরই পরাস্ত হল জন্তুটির কাছে। কিন্তু শেষে আটালান্টার তীর তার মাংস স্পর্শ করে রক্তপাত ঘটাল, আর মিলিয়েগারের বর্শা ভেদ করল তার বক্ষ। তরবারির আঘাতে মিলিয়েগার তার মুণ্ডটি ছিন্ন করল। বিজয়ের গৌরবে ও প্রেমের অনুরাগে মিলিয়েগার ভুলে গেল অন্য সব কথা—শিকারের মুণ্ডুটি সে উপহার দিল আটালান্টাকে।

মিলিয়েগারের এই আচরণে দারুণ অপমান বোধ করলেন অনেক প্রবীণ ব্যক্তি, বিশেষ করে তার মামা দু'জনে। রেগে তাঁরা আটালান্টার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলেন তার পুরস্কার। ফলে মিলিয়েগারের সঙ্গে তাঁদের হল বিরোধ। রাগের বশে মিলিয়েগার তরবারির আঘাতে হত্যা করল তার মামা দু'জনকেই।

এই মর্মান্তিক খবর যখন এল্‌থিয়ার কানে গিয়ে পৌঁছল, তখন শোকে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। সেকালে রক্তের সম্পর্ক ছিল সবচাইতে বড় সম্পর্ক। তাই আপন ভাইবোনের মধ্যে সম্পর্ককে স্থান দেওয়া হত সবার ওপরে। সহোদর ভাইদের মৃত্যুতে এল্‌থিয়া ছেলের প্রতি তাঁর সকল স্নেহ-মমতা ভুলে গেলেন। আগুন থেকে সযত্নে সরিয়ে রাখা কাঠের খণ্ডটি আবার তিনি আহুতি দিলেন আগুনে। যখন তা পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে গেল, তখন যন্ত্রণায় কালো মিলিয়েগারের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

মা হয়ে আপন সন্তানের মৃত্যু ঘটালেন এল্‌থিয়া। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর নিদারুণ নিষ্ঠুরতার কথা। এমন অমানুষিক কাজের জন্য শোকে, অনুতাপে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর সমস্ত অন্তর জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে এল্‌থিয়া আত্মহত্যা করলেন। চারদিকে উঠল আর্তনাদের রোল।

এই ভয়ানক মৃত্যুযজ্ঞে ডায়ানাদেবীর মনে করুণা হল। তিনি নিহত সবাইকে রূপান্তরিত করে দিলেন কয়েকটি আকাশবিহারী পাখীতে।

টিথোনাস্‌ ও অরোরা

প্রাচীন ট্রয় নগরীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এককালে এখানকার একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন লেওমিডন্‌। তাঁর ছিল এক ছেলে; নাম তাঁর টিথোনাস্‌ঃ যেমন বলিষ্ঠ সুঠাম তাঁর দেহ, তেমনি সুন্দর তার মুখশ্রী—সব মিলে দেবতাদের মত!

উষা কালের দেবী অরোরা—তাঁর গোলাপী আঙুলের স্পর্শে রাতের আঁধার দূর করেন, পৃথিবীর ঘুম ভাঙান। একদিন ভোরেরর আলোয় তিনি টিথোনাসকে দেখতে পেলেন তাঁর অপূর্ব দেহ-লাবণ্যে; আর দেখেই তাকে ভালোবেসে ফেললেন। তাঁকে তিনি চুরি করে নিয়ে গেলেন তার নিজের কাছে;---পুব আকাশে, সূর্যের প্রথম আলোর ছোপ লাগা, আবছায়া, মেঘেদের দেশে!

অরোরা জানতেন, টিথোনাস সাধারণ একজন মানুষ, মৃত্যু তার একদিন হবেই। কিন্তু তাঁকে তিনি নিজের করে পেতে চান চিরকালের জন্যে। তাই তিনি দেবরাজ জুপিটারের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন, টিথোনাস্‌কে যেন দিয়ে দেওয়া হয় অনন্ত জীবন। দেবরাজ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও দেবতার আশীর্বাদে টিথোনাস্‌ হলেন অমর!



কিন্তু দেবরাজের কাছে আবেদন করতে গিয়ে অরোরা করে ফেললেন এক বিষম ভুলঃ অনন্ত আয়ুর সঙ্গে চাইতে ভুলে গেলেন টিথোনাসের অটুট স্বাস্থ্য। তাই এ অর্ধেক সৌভাগ্য ক্রমে টিথোনাসের কাল হয়ে দাঁড়াল। মৃত্যুকে এড়িয়ে বরাবর তিনি প্রাণ ধরে

বেঁচে থাকলেন বটে, কিন্তু দিনে দিনে হারিয়ে ফেলেন সমস্ত রূপ-যৌবন। অচিরেই তিনি পরিণত হলেন মানুষের লোলচর্ম, কংকালসার এক করুণ প্রতিচ্ছায়ায়।

প্রতিদিন ভোরে নতুন জীবন নিয়ে জেগে ওঠা অরোরা ব্যথিত হলেন টিথোনাসের এই দুরবস্থা দেখে। কিন্তু দেবতাদেরও সাধ্য নেই তাঁদের দান ফিরিয়ে নেওয়ার। তাই অরোরা তাঁকে করুণা করে রূপান্তরিত করে দিলেন একটি দীর্ঘ, ক্ষিণকায়, সবুজবর্ণ ঘাস-ফড়িংয়ে।

অর্ফিউস্ ও ইউরিডিসি

গ্রীসের একটি বিখ্যাত প্রদেশের নাম থ্রেস্। প্রাচীনকালে এক সময়ে এখানকার রাজা ছিলেন অর্ফিউস্। রাজা বটে কিন্তু সম্পূর্ণ আরেক রকমের! রাজ্যশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ--কোন কিছু-তেই তাঁর মন নেই। একটি জিনিস নিয়েই তিনি দিনরাত মগ্ন—সে তাঁর সুরের সাধনা! সঙ্গীতের দেবতা এপোলো নিজ হাতে তাঁকে তৈরী করে দিয়েছিলেন একটি বীণা, আর কাব্যের দেবীরা তাঁকে দান করেন সুরের শিক্ষা। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ ও বীণার ঝংকারে শুধু মানুষ কেন; পশুপাখী, তরুলতাও মুগ্ধ হত। বনের পশুরা তাদের স্বভাব ভুলে তাঁর পিছে পিছে চলত, গাছপালা নত হত তাঁর কাছে! তাঁর সুরের আবেশে শিলপাথর পর্যন্ত এক যায়গা থেকে আরেক যায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিত!

অর্ফিউসের গান মুগ্ধ হয়ে শুনতেন অপ্সরী ইউরিডিসি। এমন বিভোর হয়ে তিনি মিশে যেতেন তাঁর সঙ্গীতে যে তিনি যেন তাঁর সুরমূর্ছনারই এক মানবী রূপ! সুরের বাঁধনে দু'জনে বাঁধা পড়লেন চিরকালের মত। ইউরিডিসিকে অর্ফিউস্ গ্রহণ করলেন তাঁর স্ত্রী রূপে। সুরের মোহ আর ভালোবাসার আবেশে তাদের দিন কাটতে লাগল স্বপ্নের মত!

এমনি করে বয়ে চলল দিনের পর দিন। কিন্তু হঠাৎ তাতে পড়ল ছেদ। একদিন বান্ধবীদের নিয়ে ইউরিডিসি এক প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় এক দস্যুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য হঠাৎ ছুটতে গিয়ে তিনি মাড়িয়ে দিলেন ঘাসে লুকিয়ে থাকা এক সাপকে। বিষধর সাপের কামড়ে তৎক্ষণাৎ ইউরিডিসির মৃত্যু হল!

কঠিন আঘাত গিয়ে লাগল অর্ফিউসের অন্তরে। তাঁর বীণায় বেজে উঠল গভীর বেদনার সুর। তাঁর বিলাপ আকাশ বাতাসে ধ্বনিতে হল। অলিম্পাসের চূড়াতেও গিয়ে আছড়ে পড়ল তার করুণ রেশ। কিন্তু শত আক্ষেপেও মুছবার নয় জীবন ও মৃত্যুর কঠিন সীমারেখা। অর্ফিউস্ তাই ঠিক করলেন, তিনি যাবেন পৃথিবীর সীমানা পার হয়ে, সব কিছুর শেষে, অন্ধকারে ঢাকা সেই পাতালপুরীতে। সেখানে যমরাজের কাছেই তিনি আকুতি জানাবেন তাঁর ইউরিডিসিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে।

অনেক পথ অতিক্রম করে অর্ফিউস পৌঁছলেন টিনেরাস অন্তরীপে। সেখানকার এক গভীর খাদ দিয়ে তিনি নেমে গেলেন মাটির নীচের অন্ধকার প্রেতপুরীতে। প্রাণহীন, আলোহীন সে জগতে তিনি প্রথমে উপস্থিত হলেন পাতালের রানী প্রসারপিনার কুঞ্জে। এই বাগানে কেবল সারি সারি কালো পপলার গাছ, ফুলহীন উইলো, আর বিবর্ণ এ্যাস্ফোডেল!

এ অঞ্চল পার হয়ে অর্ফিউস্ পৌঁছলেন পাতালপুরীর নদী আকেরনের তীরে। আকেরন হচ্ছে যন্ত্রণার নদী। এর স্রোতের সঙ্গে এসে মিশেছে বিলাপের নদী কসিটাস্ঃ এর ঢেউয়ে ঢেউয়ে গুমরে উঠে পৃথিবী ছেড়ে-আসা মানুষদের বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকার।



আকেরন পার হওয়ার একমাত্র ভরসা খেয়ামাঝি কেরন। কিন্তু ছেঁড়াখাড়া আলখেল্লাধারী এইবুড়ো যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি বদমেজাজী। তাকে বুঝিয়ে দিতেই হবে তার পারানির কড়ি। নইলে 'বেয়াদপ' বলে তাড়িয়ে দেবে আগন্তককে। আর আশ্রয়হীন আত্মা শুধু ঘুরে বেড়াবে মরুপ্রান্তরের পথে-বিপথে। বীণার সুরে এই কেরনকে মুগ্ধ করে অর্ফিউস্ পার হলেন পরপারের খেয়া।

এর পর আরো অনেক পথ হেঁটে অর্ফিউস্ পৌঁছুলেন যমপুরীর দরজায়। সেখানে মোতায়েন তিন-মাথাওয়ালা বিকট-স্বর পাহারাদার কুকুর, সার্‌বেরাস্। সার্‌বেরাসের লোমগুলো সাপের ফণা, আর তার লালায় ঝরে কালো বিষ। আকৃতি তার দানবীয়। অর্ফিউসের সুরঝংকারে সে-ও মাথা নুইয়ে পথ ছেড়ে দিল।

অবশেষে অর্ফিউস্ উপস্থিত হলেন পাতালপুরীর রাজা প্লুটো ও রানী প্রসারপিনার রাজসভায়—এসে দাঁড়ালেন তাঁদের সিংহাসনের সম্মুখে। তাঁর বীণার তারে বেজে উঠল শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সুর। পাতালের নিস্তব্ধ পুরীতে কেউ এমন সঙ্গীত আগে কোন দিন শোনে নি।

ভেসে বেড়ানো কায়াহীন ছায়াদের চোখে অশ্রু দেখা দিল। পরলোকে শাস্তি-পাওয়া আত্মারা ক্ষণিকের জন্যে তাদের শাস্তি ভুলে গিয়ে মুখ তুলে তাকালো। দেবতাদের রুষ্ট করে ট্যান্টালাস্ ছাতিফাটা তৃষ্ণায় বারবার যেমন অঁাজলা করে পানি মুখে তুলতে যেত, অমনি তা আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেত গলে। সিসিফাসের শাস্তি ছিল এক বিরাট পাথরকে ঠেলে ঠেলেএকটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে যতবারই সে পাথরটিকে চূড়ার কাছে নিয়েছে, ততবারই তা গড়িয়ে পড়েছে একদম নীচে। ড্যানেউসের মেয়েরা অনন্ত কাল ধরে চেষ্টা করেছে ঝাঁঝরা কলসিতে করে পানি বয়ে নিতে। ক্ষণিকের জন্যে তারা সবাই তাদের ব্যর্থ চেষ্টা থামাল। সিসিফাস তার পাথরটিতে ঠেস্ দিয়ে শুনতে লাগল অর্ফিউসের বীণা। এতকাল পরে ফিউরিদের মনও নরম হল। অবশেষে প্লুটো ও প্রসারপিনা গ্রহণ করলেন অর্ফিউসের আবেদন। কিন্তু একটি শর্ত রইল ঃ পাতালপুরীর এলাকা পার হয়ে যাওয়ার আগে তিনি যদি একবারও পেছন ফিরে তাকান, তবে আবার হারাতে হবে তাঁর ইউরিডিসিকে।

বন্ধুর পথ, নিবিড় অরণ্য, সুড়ঙ্গ, খাত পার হয়ে ফিরে চললেন অর্ফিউস্ ; ইউরিডিসি তাঁকে অনুসরণ করলেন ছায়ার মত। কিন্তু পৃথিবীর আলোর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে অর্ফিউস্ নিজের অজান্তেই হঠাৎ একবার ফিরে তাকালেন, ইউরিডিসি তাঁর সঙ্গে রয়েছে তো? মুহূর্তের এই অসাবধানতায় তাঁর সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হল। অশরীরী আকর্ষণে ইউরিডিসি আবার ফিরে চললেন পাতালপুরীতে। অর্ফিউস্ চীৎকার করে তাঁকে ডাকলেন, আবেদন করলেন দেবতাদের কাছে। কিন্তু তাঁর সকল অনুনয় ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল ছায়া-লোকের নিস্তব্ধ শূন্যতা থেকে!

সাত দিন অনাহারে অনিদ্রায় অর্ফিউস ঘুরে বেড়ালেন পাতালের প্রবেশ পথের কাছে। পরপারের দেবতাদের কাছে না হলেও তাঁর আকুতি পৌঁছল পাহাড়, পর্বত, নদী, হ্রদ, আকাশ-বাতাসে। পশুপাখী, গাছপালা তাঁর দুঃখে মুহ্যমান হল!

পৃথিবীর আনন্দ থেকে অর্ফিউস্ বিদায় নিলেন চিরদিনের জন্য। তাঁর বীণায় কেবল বেদনার সুর। যে অরণ্য-প্রান্তরে ইউরিডিসির সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন একদিন, সুরের আহবানে সেখানে তিনি তাঁকে বার বার খুঁজে ফিরলেন। কিন্তু সুরের প্রতিধ্বনি আর দেখা দিল না মানুষের রূপে!

একদিন বনের পথে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আনন্দের দেবতা ব্যাকাসের অনুচরী একদল উচ্ছল মেয়ের সঙ্গে। তারা ব্যাকাস্‌দেবের উৎসবে বেরিয়েছে। অর্ফিউস্‌কে তারা আহবান করল তাদের উৎসবে যোগ দিতে। কিন্তু অর্ফিউস্ নিজের দুঃখে বিভোর ; তাদের ডাকে সাড়া দেবেন কি করে? মেয়েরা বৃথাই ডাকল তাদের নৃত্যের সঙ্গে তাঁর বীণাধ্বনি যোগ করতে। ব্যাকাসের উৎসব-মুখর, নৃত্য-পাগল মেয়েরা ক্রমে ভীষণা হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত হয়ে তারা এক সময়ে ঢিল ছুঁড়তে লাগল অর্ফিউস্‌কে লক্ষ্য করে। কিন্তু তার বীণার শব্দের সীমানায় এসে ঢিলগুলো শান্ত হয়ে আশ্রয় নিল তাঁর পায়ের কাছে।

উড়ন্ত বর্শাও সম্মোহিত হয়ে পালকের মত মাটিতে এসে পড়ল। ব্যাকাসের ক্রুদ্ধ সেবিকার তখন শুরু করল উন্মত্ত চীৎকার। চীৎকারের কর্কশতায় বীণার সুর ক্রমে ঢাকা পড়ে যেতে লাগল। যখন তা আর একটুও শোনা গেল না, তখন নিক্ষিপ্ত ঢিল এসে পড়তে লাগল অর্ফিউসের শরীরে--ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল তাঁর সমস্ত দেহ। প্রলয়োল্লাসে ব্যাকাস্-সেবিকারা অর্ফিউসের দেহকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। তাঁর ছিন্ন মাথা আর তাঁর বীণাটি তারা ছুঁড়ে ফেলে দিল হিব্রাস্ নদীর পানিতে।

হিব্রাসের ঢেউয়ে এখনও তাই বাজে অর্ফিউসের বীণার মৃদুমন্দ সুর, আর তীরে তীরে জাগে তার মধুর প্রতিধ্বনি। তাঁর দেহের ছিন্ন অংশগুলো সংগ্রহ করে কাব্যের দেবীরা সমাহিত করলেন অলিম্পাস্ পাহাড়ের পাদদেশে, লিবেথ্রাতে। সেখানে তাঁর কবরের পাশে বুলবুল পাখীরা এমন সুরেলা কন্ঠে বিলাপ করে যে সারা গ্রীস্‌দেশে তেমনটি আর কোথাও শোনা যায় না। নদীতে বাহিত অর্ফিউসের বীণা লেস্‌বসে গিয়ে পৌঁছল। সেখান থেকে তুলে নিয়ে দেবরাজ জুপিটার তা স্থাপন করলেন তারকাদের মাঝখানে। রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকালে তারকাপুঞ্জের মাঝে আজও তোমরা দেখতে পাবে জ্বলজ্বলে অর্ফিউসের এই বীণা!

মৃত্যু হওয়ার পর পরই কিন্তু অর্ফউসের দেহের ছায়া প্রবেশ করল পাতালপুরীতে। এবার আর তাঁর পথে কোন বাধা নেই। মরু, নদী, মাঠ, বন পার হয়ে তিনি এসে মিলিত হলেন তাঁর ইউরিডিসির সঙ্গে। সেখান থেকে তাঁরা দু'জনে মিলে চলে গেলেন চিরসুখের এলিসিয়ান প্রান্তরে। সেখানে সারা সময় তাঁদের দেখা যেত এক সঙ্গে বনে, প্রান্তরে, আলো-ছায়ায় ছন্দে ছন্দে ঘুরে বেড়াতে। পাতার মর্মরে, ঝর্ণার কলকলে হঠাৎ চোখ তুলে তাকালেই দেখা যেত সুরের হিল্লোলে বয়ে যাওয়া তাঁদের মিলিত রূপ!

এখন মুগ্ধ চোখে অর্ফিউস্ তাকিয়ে দেখেন ইউরিডিসিকে যতক্ষণ তাঁর সাধ। আর কোন দিনও ইউরিডিসি হারিয়ে যাবেন না তাঁর অর্ফিউসের কাছে থেকে।